অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

সাধুবাবার লাঠি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. আদায় উসুল সেরে........................... 2

২. জগাই আর মাধাইকে 14

৩. চারদিকে কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না 32

৪. পাঁচটা সূর্যমুখী লঙ্কা.......................... 51

৫. জড়ো-হওয়া লোকজন 70

১. আদায় উসুল সেরে

আদায় উসুল সেরে গেজেতে টাকা ভরে কোমরে ভাল করে পেঁচিয়ে বেঁধে যখন নবীন গাঁয়ে ফেরার জন্য রওনা হল, তখন খেয়াল হল, শীতের বেলা ফুরিয়ে এসেছে। সন্ধে হয় হয়। বড্ড দেরি করে ফেলেছে সে। হরিপুর অনেকটা রাস্তা। প্রায় মাইলতিনেক। তার মধ্যে আড়াই মাইল হল গে জনমানবহীন ভুরফুনের মাঠ। ও মাঠে কোথাও বসতি নেই। মাঝে মাঝে জংলা জায়গা, জলা, একটা ভাঙা কেল্লা আর কিছু উদোম নিস্ফলা মাঠ। তার ভিতর দিয়েই এবড়োখেবড়ো মেঠো রাস্তা নানা বাঁক নিয়ে হরিপুর ঘেঁষে নয়াগঞ্জ অবধি চলে গেছে। সাইকেলখানা থাকলেও হত। কিন্তু সেখানা এই কাল রাতেই চুরি হয়ে গেছে ভিতরের বারান্দা থেকে। কাজেই হেঁটে আসতে হয়েছে নবীনকে। হেঁটেই ফিরতে হবে। সঙ্গীসাথী থাকলেও হত। কিন্তু কপাল খারাপ। আজ সঙ্গীসাথীও কেউ নেই। ভুরফুনের মাঠের বদনাম আছে। একসময়ে ঠ্যাঙাড়ে, ঠগিদের অত্যাচার ছিল খুব। এখন সে আমল নেই বটে, কিন্তু খারাপ লোকের তো আর আকাল পড়েনি। তা ছাড়া অন্য সব কথাও শোনা যায়। পারতপক্ষে রাতবিরেতে ও পথে কেউ পা বাড়ায় না।

কিন্তু ভয়ের কথা ভাবলেই ভয় আরও বেশি করে চেপে ধরে। ফিরতে যখন হবেই তখন ঠাকুরের নাম নিয়ে বুক ঠুকে রওনা হওয়াই ভাল।

হরিবোলজ্যাঠা মস্ত মহাজন। তার আড়তেই নবীনদের ধান, চাল, গম, আলুর চালান বেশি। অন্য সব মহাজনও আছে। সব মিলিয়ে

আদায় আজ বড় কম হয়নি। হরিবোলজ্যাঠা হাফ চশমার উপর দিয়ে তলচক্ষুতে চেয়ে বলল, "ওরে নবীন, সন্ধে করে ফেললি বাপ, অতগুলো টাকা নিয়ে রাতবিরেতে যাবি! বরং আজ গদিতেই থেকে যা। ভোর-ভোর রওনা হয়ে পড়বি।"

নবীনের সে উপায় নেই। আজ হরিপুরে মস্ত যাত্রার আসর। ব্যবস্থাপকদের মধ্যে নবীনও আছে। মাথা নেড়ে বলল, "তাড়া আছে জ্যাঠা। নইলে থেকেই যেতাম।"

"তা হলে বরং একটা লাঠিসোটা কিছু সঙ্গে রাখ। বদ বজ্জাতরা হাতে লাঠি দেখলে তফাত যাবে।"

"লাঠিকে আজকাল কেউ ভয় পায় না জ্যাঠা। বিপদে পড়লে বরং দৌড় লাগানো ভাল।"

"দুর বোকা, লাঠিই মানুষের চিরকেলে অস্তর। অন্তত শেয়াল কুকুর তাড়া করলে তো কাজে দেবে। সঙ্গে থাকলে একটা বলভরসা হয়। দাঁড়া, দেখি আমার কাছে কিছু আছে কিনা।"

হরিবোলজ্যাঠার গদির তক্তপোশের তলা থেকে গোটাকয়েক ধুলোমলিন লাঠি টেনে বের করল গদির কর্মচারী জগা। ন্যাকড়া দিয়ে মুছেটুছে হরিবোলজ্যাঠার সামনে রাখল। জ্যাঠা ভাল করে নিরখ পরখ করার পর একখানা লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে বলল, "তুই এইটে নিয়ে যা। কয়েক বছর আগে হিমালয় থেকে এক সাধু এসে দিয়ে গিয়েছিল। পায়ে ঘা হয়ে দিনকতক আমার চণ্ডীমণ্ডপে ছিল বেচারি। রামকবিরাজকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে ঘা সারিয়ে দিয়েছিলাম। সাধু যাওয়ার সময় লাঠিগাছ দিয়ে গিয়েছিল। আমার তো কোনও কাজে লাগে না। তুই-ই নিয়ে যা। তোকে দিলাম।"

নবীন দেখল, লাঠিটা তার মাথার সমান লম্বা। আর খুব ভারী। লাঠির দুই প্রান্ত লোহায় বাঁধানো। নিরেট, মজবুত লাঠি। হাতে নিলে একটা ভরসা হয়। আরও একটা ভরসার কথা হল, আজ শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী। সুতরাং সন্ধের পর জ্যোৎস্না ফুটবে।

হরিবোলজ্যাঠার আড়ত থেকে বেরিয়ে ভেলুর দোকানে গিয়ে ঢুকল নবীন। এ-দোকানের বিখ্যাত শিঙাড়া আর জিলিপি না খেলে জীবনই বৃথা। ফুলকপি, আলু, কিশমিশ আর বাদাম দিয়ে শিঙাড়াটা যা বানায় ভেলু, তেমনটি এ-তল্লাটে আর কেউ পারে না।

জিলিপিটাও সাড়ে সাত প্যাঁচের মধুচক্র। দেরি যখন হয়েই গেছে তখন আর পনেরো মিনিটে কী-ই বা ক্ষতি! খিদেপেটে তিন মাইল হাঁটাও সম্ভব নয়।

ভেলুর দোকানে যেন রাসমেলার ভিড়, গঞ্জে যত ব্যাপারী মাল গস্ত করতে আসে সবাই হামলে পড়ে এই দোকানটাতেই। কাজেই নবীনকে নানা কসরত করে শিঙাড়া, জিলিপি জোগাড় করতে হল। তাতেও গেল মিনিট দশেক। এক কোণে বসে মন দিয়ে খাচ্ছিল সে। উলটো দিকে বসা রোগা সুড়ুঙ্গে চেহারার খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা একটা লোক বলল, "ভাই, তুমি লেঠেল নাকি?"

নবীন একটু অবাক হয়ে চাইল। তারপর নিজের হাতে ধরা লাঠিটা খেয়াল হল তার। বলল, "তা বলতে পারেন।"

"প্যাঁচপয়জার জানা আছে তা হলে?"

"তা একটু-আধটু জানি বই কী!" কথাটা অবশ্য ডাহা মিথ্যে। নবীন কস্মিনকালেও লাঠি খেলতে জানে না। তবে লাঠিটা হাতে থাকায় তার বেশ একটা বলভরসা হচ্ছে।

ঢ্যাঙা লোকটা একটা কচুরিতে কামড় দিয়ে বলল, "সনাতন ওস্তাদের নাম শুনেছ?"

নবীন নির্বিকার মুখে বলল, "আজ্ঞে না।"

"সেকী হে! লাঠিবাজি করো আর ওস্তাদ সনাতনের নাম জানো?"

"তিনি কে বটেন?"

আলুর ঝোল সাপটানো কচুরিটা মুখে পুরে কাঁধের গামছায় হাত পুঁছে তাড়াতাড়ি জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে লোকটা বলল, "নমস্য ব্যক্তি হে, নমস্য ব্যক্তি। আমিও কিছুদিন তাঁর শাগরেদি করেছিলুম। তা পেটের ধান্দায় বেরিয়ে পড়তে হল বলে বিদ্যেটা শেখাই হল না। বলি পটাশপুরের নাম জানা আছে?"

শিঙাড়া চিবোতে-চিবোতে আরামে নিমীলিত চোখে চেয়ে নবীন বলল, "আজ্ঞে না।"

"ভূগোলে তো দেখছি তুমি খুবই কাঁচা হে।"

"আজ্ঞে, বেজায় কাঁচা।"

"এখান থেকে যদি পুবমুখো রাস্তাটা ধরো তা হলে মাইলপাঁচেক গেলে বিষ্ণুপুর গাঁ। সেখান থেকে বাঁ হাতে যে রাস্তাটা গড়সীতারামপুর গেছে সেটা ধরে ক্রোশ দুই গেলে শ্মশানেশ্বরী কালীমন্দির। ভারী জাগ্রত দেবী, একসময়ে নরবলি হত। সেখান থেকে ডানহাতি কাঁচা রাস্তা ধরে আরও ক্রোশ দুই গেলে বাতাসপুর। বলি বাতাসপুরের নাম শুনেছ?"

"কস্মিনকালেও না।"

"সেখানকার যজ্ঞেশ্বরের মন্দিরের লাগোয়া পুকুরে পাঁচশো হাজার বছর বয়সি ইয়া বড় বড় কাছিম গিজগিজ করছে। এক-দেড় মন ওজন, বাতাসপুরের গুড়ের বাতাসা বিখ্যাত জিনিস, আড়ে-দিঘে এক বিঘত করে, ওজনদার জিনিস।"

"কথাটা হচ্ছিল পটাশপুর নিয়ে।"

"আহা বাতাসপুরে পৌঁছেলে, আর পটাশপুর তো এসেই গেল প্রায়।"

"পৌঁছে গেছি! বাঃ।"

"না হে, পৌঁছোওনি। ওখানে একটি বাধক আছে। বাতাসপুরের ধারেই একটা পাজি নদী আছে। ধলেশ্বরী। চোত-বোশেখে তেমন

তেজি নয়, কিন্তু জষ্টি থেকে মাঘ-ফাল্গুন অবধি একেবারে ভৈরবী। খেয়া পার হওয়াই কঠিন। তা ধলেশ্বরী পেরোলেই নয়াগঞ্জ। দিব্যি জায়গা। রোজ বাজার বসে, বুধবারে হাট,

পয়সাওলা লোকের অভাব নেই। নয়াগঞ্জের বেগুন খেয়েছ কখনও? মনে হবে বেগুন তো নয়, মাখন। লোকে বলেও তাই, মাখনি বেগুন।”

“তা বেগুনের পরেই কি পটাশপুর?”

“আরে, অত তাড়াহুড়োর কী আছে? চারদিক দেখতে-দেখতে চাখতে-চাখতে যাওয়াই তো ভাল। নয়াগঞ্জে আমার খুড়শ্বশুরের বাড়ি যে হে। বিশাল তেলের কারবার। মাস গেলে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা রোজগার। পেল্লায় দোতলা বাড়ি, সঙ্গে আমবাগান। সেখানে দুদিন বডি ফেলে দিলে দিব্যি তাজা লাগবে। যত্নআত্তি করে খুব। দু’বেলা গরম ভাতে ঘি, শেষপাতে ঘন দুধ আর মর্তমান কলা বাঁধা। নয়াগঞ্জ থেকে তোর-ভোর বেরিয়ে পড়লে দুপুর নাগাদ দুধসাগরে পৌঁছে যাবে। দুধসাগরের রাজবাড়ি তো দ্যাখোনি! দেখার মতোই বাড়ি। সাত-সাতটা মহাল। তবে এখন সবই ভগ্নদশা। বুড়ো রাজা এখনও বেঁচে আছেন। মাথায় একটু গণ্ডগোল, সারাদিন বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ান আর বিড়বিড় করেন। ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকফোকর দিয়ে রাজ্যের গোরু-ছাগল ঢুকে রাজবাড়ির বাগানে ঘাস খায়।”

“তা হলে পটাশপুরে আর পৌঁছোনো হল না আজ! আমাকে উঠতে হবে মশাই, একটু তাড়া আছে।”

“আহা, পটাশপুর তো এসেই গেছে হে। দুপুরটা দুধসাগরে জিরিয়ে নাও, তারপর পড়ন্তবেলায় যদি হাঁটা ধরো তা হলে পদ্মপুকুরে পৌঁছোতে সন্ধে। রাতটা জিরেন নাও। পদ্মপুকুর বিরাট গঞ্জ জায়গা। আগরওয়ালাদের ধর্মশালায় দিব্যি ব্যবস্থা। তিন টাকায় শতরঞ্চি আর কম্বল পাওয়া যাবে, সঙ্গে খাঁটিয়া। রাতে তিনটি টাকা ট্যাঁক থেকে খসালে তেওয়ারির হোটেলে চারখানা ঘি মাখানো গরম রুটি আর ঘ্যাঁট পাওয়া যাবে। আর একখানা আধুলি যদি খসাও তা হলে ঘন অড়হরের ডাল। আর চাই কী? তারপর ঘুমখানা যা হবে না, একশো ছারপোকার কামড়ও টের পাবে না।”

“আচ্ছা আচ্ছা মশাই, বাকিটা পরেরবার শুনব’খন। আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে।”

“ওরে বাপু, আমিও কি এই অখদ্দে মাধবগঞ্জে পড়ে থাকব নাকি? আমাকে তো উঠতে হবে হে৷ এখনও তো দেড়খানা জিলিপি তোমার পাতে পড়ে আছে। ওটুকু খেতে-খেতেই আমার কথা ফুরিয়ে যাবে। পদ্মপুকুরের কথা যা বলছিলাম, ওখান থেকে সকালে বেরিয়ে পড়লে পটাশপুর আর কতদূর? মাঝখানে শুধু দোহাটা আর মুগবেড়ে। দোহাটার কথা না হয় আজ থাক। তবে মুগবেড়ে কিন্তু খুব ভূতুড়ে জায়গা। চারদিকে বাঁশবন আর একশো-দেড়শো বছরের বট-অশ্বত্থ গাছ। দিনের বেলাতেও গা-ছমছম করে। মেলা তান্ত্রিক আর যোগী পুরুষের বাস। যারা ভূতে বিশ্বাস করে না তাদের যদি একবার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারো, তা হলে দেখবে রাম রাম করে পালাবার পথ পাবে না। সন্ধের পর তো ভূতের একেবারে মোচ্ছ লেগে যায়। চারদিকে ভাম-ম গন্ধ, চিমসে গন্ধ, প্রাণ জল করা হি হি হাসি, খখানা সুরের ফিসফাস। বাপ রে, হাজারে বিজারে অশরীরী।”

“আমার জিলিপি কিন্তু আর আধখানা আছে।”

“ওতেই হবে। একটু চিবিয়ে খাও। মুগবেড়েতে রাতে থাকার সুবিধে নেই, দরকারও নেই। বরং একটু জোর পায়ে হেঁটে জায়গাটা পেরিয়ে গিয়ে এক ক্রোশ দক্ষিণে ছোট পিশুনিয়া গ্রামে দিঘির ধারে গোবিন্দর তেলেভাজার দোকানে বসে একপেট মুড়ি-বেগুনি সাঁটিয়ে নাও। ঘুগনিটাও বড্ড ভাল বানায়। ছোট পিশুনিয়ায় যা খাবে নির্ভয়ে খেতে পারো। শুধু খাওয়ার পর একঘটি জল খেয়ে নিয়ো, ঘণ্টাটাক বাদে পেট খিদের চোটে হাঁচোড়পাঁচোড় করবে।”

“এই যে, জিলিপির শেষ টুকরোটা মুখে দিলাম কিন্তু।”

“আহা, গিলে তো খাবে না হে বাপু। চিবোতে একটু সময় তো লাগবে। তারিয়ে-তারিয়ে খাও। বলছিলুম ছোট পিশুনিয়া থেকে চারদিকে চারটে পথ গেছে। পশ্চিমের পথ ধরে নাক বরাবর দু’ক্রোশ গিয়ে লতাবেড়ের জঙ্গল। ঘাবড়িয়ো না, আজকাল আর বাঘ-ভালুক

নেই। কয়েকটা শেয়াল আর এক-আধটা নেকড়ে থাকতে পারে। নির্ভয়ে ঢুকে যাও জঙ্গলে। ঘণ্টাদুই হেঁটে জঙ্গল থেকে বেরিয়েই দেখবে পটাশপুর তোমার জন্য কোল পেতে বসে আছে।”

“যাক বাবা, পৌঁছোনো গেল তা হলে।”

“সবুরে মেওয়া ফলে হে বাপু। এই যে পথটা চিনিয়ে দিলুম, এখন চোখ বুজেও যেতে পারবে।”

“চেষ্টা করে দেখব’ খন। তা হলে আজ আসি।”

“ওরে বাপু, এত কষ্ট করে পটাশপুরে যে পৌঁছোলে তাতে লাভটা কী হল সেটা তো জানা থাকা চাই।”

“লাভ-লোকসান ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথা ঘুরছে।”

“ওহে বাপু, ওখানেই তো সনাতন ওস্তাদের বাস।” নবীন অবাক হয়ে বলল, “সনাতন ওস্তাদ! সে আবার কে?”

“তুমি দেখছি বড্ড আহাম্মক হে! সনাতন লেঠেলের কথাতেই তো পটাশপুরের কথা উঠল।”

“তা বটে। কিন্তু কথাটা উঠছে কেন?”

“উঠবে না! যেখানেই লাঠি সেখানেই সনাতন ওস্তাদের কথা। ভূ-ভারতে ওরকম লাঠিয়াল পাবে না। যদি লাঠিবাজিই করতে চাও তবে একবার পটাশপুরে গিয়ে সনাতন ওস্তাদের আখড়ায় তালিম নিয়ে এসো। লাঠি কীভাবে ধরতে হয়, সেটা শিখতেই ছ’মাস লাগে। লাঠি দেখতে নিরীহ ঠ্যাঙা, কিন্তু ওনার হাতে পড়লে বন্দুকের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। তাই বলছিলুম–”

নবীন উঠে পড়ল। বলল, "কে বলেছে মশাই, যে আমি লাঠিখেলা শিখতে চাই? আমার পটাশপুরে যাওয়ারও ইচ্ছে নেই, সনাতন ওস্তাদের কাছে তালিম নেওয়ারও দরকার নেই। বুঠমুট আমার খানিকটা সময় নষ্ট করলেন।"

লোকটা সরু চোখে চেয়ে বলল, "তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম বাপু। ট্যাঁকে না তোক হাজারত্রিশেক টাকা নিয়ে রাতবিরেতে ভুরফুনের মাঠ পেরোতে হলে শুধু ভগবানের ভরসা না রাখাই ভাল। তা হাতের লাঠিখানা যদি চালানোর বিদ্যে জানা থাকত তা হলে খারাপটা কী হত শুনি!"

নবীন হাঁ। বাস্তবিক আজ তার গেজেতে ত্রিশ হাজার টাকার মতোই আছে। যে খবর এ লোকটার জানার কথা নয়। তার উপর সে যে ভুরফুনের মাঠ পেরোবে সে খবরই বা এ রাখে কোন সুবাদে! চোর ডাকাত নয় তো!

লোকটা যেন তার মনের কথা শুনতে পেয়ে বলল, "না হে বাপু, আমি চোর-ডাকাতও নই, তাদের আড়কাঠিও নই। তবে কিনা তাদের খুব চিনি। চারদিকেই আড়ে-আড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব। চেনার জো নেই। দেখার চোখ থাকলে অবশ্য ঠিকই দেখতে পেতে।"

নবীন একটু ভড়কে গিয়েছিল। গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "আ আপনি কে বলুন তো!"

লোকটা চারখানা জিলিপির ফরমাশ দিয়ে নবীনের দিকে চেয়ে নিমীলিত নয়নে নরম গলায় বলল, "সে খতেনে বাপু তোমার কাজ কী? আমি হলুম গে ভবঘুরে মানুষ। মানুষজন দেখে বেড়ানোই কাজ। ওই যে সবুজ জামা পরা লোকটা তোমার পিছনের টেবিলে বসে চপ খাচ্ছিল তাকে লক্ষ করেছ?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে তো তোমার চোখ থেকেও নেই। অমন দিনকানারাতকানা হলে গাঁট তো যাবেই, প্রাণটা নিয়েও টানাটানি হতে পারে। শুধু লাঠি চমকালেই তো হবে না। চোখ, মগজ, হুশ

এগুলো যদি কুলুপ এঁটে রাখো, তবে লড়বে কীসের জোরে? মানুষের আসল অস্তরই তো ওগুলো। বলে রাখলুম, সবুজ জামা কিন্তু তোক ভাল নয়। তোমার উপর নজর রাখছে।”

নবীন শুকনো মুখে ফের ধপাস করে বসে পড়ে বলল, “তা হলে কী করা যায় বলুন তো!”

“দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও। জিলিপিটা আগে শেষ করি, তারপর ভেবে বলব।”

“কিন্তু আমার যে বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে! হরিপুরে আজ যাত্রার আসর কিনা! আমিই যে ক্লাবের সেক্রেটারি।”

লোকটা সরু চোখে চেয়ে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, “যাত্রা! তা কী পালা হচ্ছে?”

“আজ্ঞে, নতুন একটা সামাজিক পালা, “ওগো বধূ সুন্দরী।”

“দুর দুর, ওসব ম্যাদামারা পালা দেখে জুত নেই।”

“আজ্ঞে, পালাটা খুব নাম করেছে। চিতপুরের দল। অনেক টাকার বায়না।”

লোকটা দ্বিতীয় জিলিপিটায় কামড় বসিয়ে বলল, “ভাল পালা বলছ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব নাম। বায়না নিতেই চায় না।”

“বলি তলোয়ার খেলা টেলা আছে?”

“তা আছে বোধহয়। আজকাল ঝাড়পিট না হলে লোকে তেমন নেয় না।”

“তা না হয় হল। কিন্তু রাতে খ্যাটনের কী ব্যবস্থা?”

“সে হয়ে যাবে’খন। যাবেন?”

“দাঁড়াও, আগে সব জেনেবুঝে নিই। শোওয়ার ব্যবস্থা কেমন?”

“সেও হয়ে যাবে’ খন। ”

“আমি ভবঘুরে বটে, কিন্তু গায়ে বনেদি রক্তটা তো আছে। মোটা চালের ভাত, পাশবালিশ ছাড়া ঘুম, ওসব আমার চলবে না।”

“সেসব ব্যবস্থাও হবে। ভাববেন না।”

“তা হলে লাঠিগাছ আমার হাতে দাও। তোমাকে দেখেই বুঝেছি যে তুমি আনাড়ি।”

নবীন মনে একটু জোর পেল। লোকটা রোগাপটকা বটে, কিন্তু পাকানো শক্ত চেহারা। হুঁশিয়ার, পোড়-খাওয়া লোক। চল্লিশ বিয়াল্লিশের মতো বয়স। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে সবুজ শার্ট, তার উপর একটা খয়েরি রঙের হাফ সোয়েটার। নবীন লাঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, “আপনার নামটা?”

“নিমাই রায়। তুমি নিমাইদা বলেই ডেকো।”

“আমি হলুম নবীন সাহা।”

“আর বলতে হবে না। জটেশ্বর সাহার ছেলে তো? তোমাদের বিস্তর ধানজমি, চাল আর তেলের কল আছে। একটা মুদিখানাও।”

নবীন অবাক হল না। লোকটা হয়তো অন্তর্যামী, সাধক-টাধকদের ওসব গুণ থাকে।

লোকটা ফের যেন তার মনের কথা টের পেয়ে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, “না রে বাপু। আমি অন্তর্যামী-টামি নই। তবে আমার বাতিক হল, মানুষের খবর-টবর রাখা। এই গঞ্জের বাজারে যত লোক আনাগোনা করে তাদের প্রায় সবার নাড়িনক্ষত্র আমার নখদর্পণে।”

নবীন নিজের আর নিমাইয়ের খাবারের দামটাও মিটিয়ে দিল। নিমাই বিশেষ আপত্তি করল না।

গঞ্জের সাঁকোটা পেরিয়ে নির্জন মাঠের রাস্তায় পড়েই নবীন হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলে নিমাই বলল, “উঁহু, অত জোরে হেঁটো না। লোকে সন্দেহ করবে। দুলকি চালে হাঁটো, বদমাশরা যাতে বুঝতে না পারে যে ভয় পেয়েছ। ভয় হল মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুর।”

শীতের সন্ধে। চারদিকে একটা ভূতুড়ে কুয়াশা পাকিয়ে উঠছে। আবছায়ায় যতদূর চোখ যায়, মাঠঘাট শুনশান। জনমনিষ্যি নেই। চারদিকটা থমথম করছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর নিমাই হঠাৎ চাপা গলায় বলে উঠল, “একটা কথা বলে রাখছি তোকে।”

নবীন তটস্থ হয়ে বলে, “কী কথা নিমাইদা?”

“এই শীতকালে ফুলকপির পোরের ভাজা তোর কেমন লাগে?”

“খুব ভাল।”

“আমারও।”

“সে হয়ে যাবে, ভাববেন না।”

“আর কড়াইশুটি দিয়ে সোনা মুগের ডাল?”

“তাও হবে।”

“ভাল ঘি আছে বাড়িতে?”

“খাঁটি সরবাটা ঘি।

"গরম ভাতে এক খাবলা ঘি হলে কাঁচালঙ্কা দিয়ে মন্দ লাগে না। কী বলিস? মাছ-মাংসের উপর আমার তেমন টান নেই, তবে রুই মাছের কালিয়াটা খারাপ নয়।"

"ধরে নিন হয়েই গেছে।"

২. জগাই আর মাধাইকে

জগাই আর মাধাইকে অনেকে নামের মিল দেখে ভাই বলে মনে করে। কিন্তু আসলে তারা ভাই নয়, বন্ধু বলা যায়। জগাইয়ের নাম জগন্নাথ, আর মাধবের নাম মাধবচন্দ্র। পদবিও আলাদা-আলাদা। জগাই আগে গঞ্জে গামছা বিক্রি করত। মাধাইয়ের ছিল আয়না, চিরুনি, চুলের ফিতে ফিরি করে বেড়ানোর ব্যবসা। কোনওটাতেই সুবিধে হচ্ছিল না বলে একদিন দুজনে একসঙ্গে বসে ভাবতে শুরু করল। ভেবেটেবে দু'জনে মোট দু'শো সাতাত্তর টাকা খরচ করে তেলেভাজার দোকান দিল, আর ভগবানও মুখ তুলে চাইতে লাগলেন। আশপাশে ফুলুরি-বেগুনির বিস্তর দোকান থাকা সত্ত্বেও জগাই-মাধাইয়ের দোকান ঝমাঝম চলতে লাগল। এক-একদিন দু' তিনশো টাকা বিক্রি। মাথাপিছু নিট আয় দিনে একশো-দেড়শোয় দাঁড়িয়ে গেল। ব্যবসা যখন জমে গেছে ঠিক সেই সময়েই একদিন সদলবলে পানুবাবু এসে হাজির। পানুবাবুর বাবরি চুল, জম্পেশ গোঁফ, গালপাট্টা, গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবি, পরনে ময়ূর ধুতি, পায়ে দামি চপ্পল। সাতটা গাঁয়ের লোক পানুবাবুকে যমের মতো ভয় করে। শালপাতার ঠোঙায় দলবল নিয়ে বিস্তর তেলেভাজা সেঁটে "বেশ করেছিস তো" বলে পানুবাবু দাম না দিয়েই উঠে পড়লেন। বললেন, "আমার নজরানা দেড়শো টাকা ওই পটলার হাতে দিয়ে দে।"

না দিয়ে উপায় নেই। জগাই-মাধাইও দিল। প্রথম প্রথম সপ্তাহে একদিন-দু'দিন এরকম অত্যাচার চলতে লাগল। মাসখানেক বাদে সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন। রোজ যে পানুবাবু আসতেন তা নয়। তাঁর দলবল দশ-বারোজন এসে হামলা করত। মোড়ল-মাতব্বর ধরেও লাভ হল না। গঞ্জের সব ব্যাবসাদারকেই তোলা দিতে হয় বটে, কিন্তু জগাই-মাধাইয়ের উপর অত্যাচারটা যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের। তা বেচারারা আর কী করে, দোকানটা তুলেই দিল। ফের দু'জনে ভাবতে বসল। ভেবেটেবে দু'জনে মিলে একটেরে ছোট্ট একখানা মনিহারি দোকান খুলল। খুলতে না-খুলতেই পানুবাবুর দলবল এসে হাজির। তারা ধারে জিনিস নিতে লাগল টপাটপ। তোলা আদায় তো আছেই।

জগাই-মাধাই ফের পথে বসল। কেন যে পানুবাবু তাদের মতো সামান্য মনিষ্যির সঙ্গে এমন শত্রুতা করছেন তা বুঝতে পারছিল না।

মাধাই বলল, “বুঝলি জগাই, এর পিছনে ষড়যন্ত্র আছে। কেউ পানুবাবুকে আমাদের উপর লেলিয়ে দিয়েছে।”

“সেটা আমিও বুঝতে পারছি। শেষে কি গঞ্জের বাস তুলে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে?”

“তাই চল বরং। গঞ্জ ছেড়ে ছোটখাটো কোনও গাঁয়ে গিয়ে ব্যবসা করি। বড় বড় মানুষ বা ষণ্ডা-গুন্ডাদের সঙ্গে কি আমরা পেরে উঠব? আমাদের না আছে গায়ের জোর, না মনের জোর,না ট্যাঁকের জোর।”

“তা ছাড়া আর একটা জোরও আমাদের নেই। বরাতের জোর।”

“ঠিক বলেছিস।”

“তা হলেই ভেবে দ্যাখ, নতুন জায়গায় গিয়েও কি আমাদের সুবিধে হবে? গাঁয়ের লোক উটকো মানুষ দেখলে হাজারও খতেন নেবে। কোথা হতে আগমন, কী মতলব, নাম কী, ধাম কোথা, মুরুব্বি কে, ট্যাঁকের জোর কত। তারপর গাঁয়ের লোকের নগদ পয়সার জোর নেই, ধারবাকি করে খেয়ে ব্যাবসা লাটে তুলে দেবে।”

মাধাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তা বটে, আমাদের মুরুব্বির জোরও তো নেই। হ্যাঁরে, লটারি খেলবি?”

“বারদশেক খেলেছি। দশবারই ফক্কা।”

“না রে, আমার মাথা ঠিক কাজ করছে না।”

"আমারও না।"

পিছন থেকে কে যেন মোলায়েম গলায় বলে উঠল, "আমার মাথাটা কিন্তু দিব্যি খেলছে।"

দু'জনেই একটু চমকে উঠে পিছন ফিরে চাইল। কিন্তু পিছনে কেউ নেই দেখে মাধাই বলল, "একী রে বাবা! কথাটা কইল কে? ও জগাইদা!"

জগাইও হাঁ হয়ে বলল, "তাই তো! স্পষ্ট শুনলুম।"

একটা গলাখাঁকারি দিয়ে কণ্ঠস্বর ফের বলল, "ঠিকই শুনেছ, ভুল নেই।"

দু'জনের কথা হচ্ছিল ভর সন্ধেবেলা গঞ্জের খালের ধারে ফাঁকা হাটের একটা চালার নীচে বসে। বাঁশের খুঁটির উপর শুধু টিনের চাল। ন্যাড়া ফাঁকা ঘর, কোনও আবরু নেই, হাওয়া বাতাস খেলছে।

মাধাই বলল, "দ্যাখ তো জগাই, টিনের চালের উপর কেউ ঘাপটি মেরে বসে কথা কইছে কি না।"

জগাই দেখেটেখে বলল, "না, চালের উপর তো কেউ নেই।"

গলাটা খিক করে হেসে বলল, "জন্মে কখনও টিনের চালে ওঠার অভ্যেস নেই আমার। বুঝলে!"

মাধাই তটস্থ হয়ে বলে, "আপনি কে আজ্ঞে? দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

গলাটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, "দেখাদেখির দরকারটা কী? চাই তো বুদ্ধি-পরামর্শ? দেখে হবে কোন কচুপোড়া?"

"আজ্ঞে, ভয়ডরেরও তো ব্যাপার আছে।"

গলাটা ফের খিঁচিয়ে উঠে বলল, "কেন, ভয়ের আছেটা কী? ব্যবসাপত্তর তো লাটে উঠেছে, ভিটেমাটি ছাড়ার জো, এখন আর ভয়টা কীসের শুনি! কথায় বলে ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।"

"কিন্তু আমার যে বেজায় ভয় করছে। ওরে জগাই, তোরও করছে তো!"

"দাঁড়াও, ভেবে দেখি। হ্যাঁ গো মাধাইদা, আমার গা-টা বেশ শিরশির করছে, হাত-পায়ে যেন একটা খিল-ধরা ভাব, গলাটাও কেমন শুকনো-শুকনো। এ তো ভয়েরই লক্ষণ মনে হচ্ছে।"

গলাটা বেজায় খাপ্পা হয়ে বলল, "ওসব মোটেই ভয়ের লক্ষণ নয়। আজ দুপুরে ভাত খাওনি বলেই ওসব হচ্ছে।"

জগাই কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "দুশ্চিন্তায় খাওয়াদাওয়া যে মাথায় উঠেছে মশাই, খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি।"

"ওসব খবর আমার জানা, তাই তো বলছি, ওসব মোটেও ভয়ের লক্ষণ নয়। তবে ভয় পাওয়ার সুবিধেও আছে। ভয় থেকে নানা ফিকির মাথায় আসে।"

জগাই একগাল হেসে বলল, "আপনি বেশ বলেন তো! তা আপনি কে বলুন তো! ভূতপ্রেত নাকি?"

"ওসব পুরনো বস্তাপচা কথা যে কেন তোমাদের মাথায় আসে তা কে জানে বাবা। ভূতপ্রেত মনে করার দরকারটাই বা কী? একজন বন্ধুলোক বলে ভাবলেই তো হয়!"

"তা নামটা?"

"কণ্ঠস্বর হলে কেমন হয়? ভাল না?"

জগাই গদগদ হয়ে বলে, "চমৎকার নাম।"

মাধাই তাড়াতাড়ি বলল, "তা কণ্ঠস্বরের কণ্ঠ লাগে। আপনার কণ্ঠটাও তত দেখা যাচ্ছে না মশাই।"

কণ্ঠস্বর এবার খ্যাক করে একটু হেসে বলল, "বলিহারি বাপু তোকে, বলি কণ্ঠ কি একটা দেখবার মতো জিনিস! জন্মে শুনিনি বাপু কেউ কারও গলা দেখতে চায়।"

মাধাই কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "তা মুখের ছিরিখানা যখন দেখাচ্ছেন না

তখন কণ্ঠটা দেখলেও একটু ভরসা পাওয়া যেত আর কী! ভয়ডরের একটা ব্যাপার তো আছে!"

"দ্যাখ মেধো, তোকে বহুকাল ধরে দেখে আসছি, লোক তুই মন্দ নোস বটে, কিন্তু জগাইয়ের মাথায় যে একরত্তি বুদ্ধি আছে তোর সেটুকুও নেই। বলি, গোটা মানুষটা ছেড়ে যদি শুধু তার গলাটা দেখতে পাস, তা হলেই কি তোর ভয় কমবে?"

মাধাই কুঁকড়ে গিয়ে বলল, "আজ্ঞে, সেটাও ভাববার কথা।"

"তবে! তার চেয়ে এই যে আমি মোটামুটি গায়েব হয়ে আছি। সেটাই কি ভাল নয়!"

"এখন তাই মনে হচ্ছে বটে।"

জগাই তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলল, "আমাদের দোষত্রুটি নেবেন না কণ্ঠদাদা, অবস্থা গতিকে আমরা বড্ড ঘেবড়ে আছি৷ মাথায় কোনও মতলব আসছে না।"

কণ্ঠস্বর বলল, "সে আমি খুব বুঝতে পারছি। ভেবেছিলুম কাউকে কোনওদিন বলব না। এসব গুহ্য কথা বলার আমার দরকারটাই বা কী? ধনরত্নে তো আর আমার কাজ নেই। কিন্তু তোদের অবস্থা দেখে আজ বড্ড বলি বলি ভাব হচ্ছে। ভাবলাম আহা এসব জিনিস এ-দুটো দুঃখী লোকের ভোগে লাগুক। দুনিয়ার ভালমন্দ জিনিস তো এরা চোখেও দেখেনি, চেখেও দেখেনি। সেই জন্যেই বলছি, মন দিয়ে শোন। শুনছিস তো?"

জগাই বলল, "কান খাড়া করে শুনছি কণ্ঠদাদা, আর শুনতে লাগছেও বেজায় ভাল। সত্যি কথা বলতে কী, সেই গেলবার রাসের দিনে রামশঙ্কর ভটচাজমশাইয়ের কীর্তনের পর আর কিছু এত ভাল লাগেনি। কী বলো মাধাইদা?"

মাধাই বেজার মুখে বলল, "তা কেন, শ্যামগঞ্জে সেবার যে নিমাই সন্ন্যাস' পালা শুনলাম, তাই বা মন্দ কী?"

"তা বটে, সেইসঙ্গে মুকুন্দ রক্ষিতের কথকতার কথাও বলতে হয়, আহা, আজও চোখে জল আসে।"

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। কণ্ঠস্বর ভারী মনমরা গলায় বলল, "নাঃ, তোদের দিয়ে হবে না রে, বলে লাভ নেই। টাকাপয়সার কথা শুনে কোথায় হামলে পড়বি, তা না, রাজ্যের বাজে কথা এনে ফেললি!"

জগাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, "দোহাই কণ্ঠদাদা, আর দগ্ধে মারবেন না। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলে যে মারা পড়ব।"

মাধাইও গোঁ ধরে বলল, "তোরই তো দোষ। একটা গুরুতর কথা হচ্ছে, ধাঁ করে কেত্তন এনে ফেললি। ওতেই তো আমাদের সব কাজ ভন্ডুল হয়ে যায়।"

চোখ মিটমিট করে জগাই বলল, "ও কণ্ঠদাদা, আছেন কি?"

"আছি রে আছি। আজ তোদের ভাগ্যের চাকা ঘোরাব বলেই এখনও আছি। কিন্তু চাকা কি সহজে ঘুরবে? তোদের বুদ্ধির দোষে মরচে পড়ে আঁট হয়ে আছে। এখন মন দিয়ে শোন। ভুরফুনের মাঠ তো চিনিস?"

একগাল হেসে জগাই বলল, "তা চিনি না! এই তো খাল পেরোলেই সেই তেপান্তর।"

"ভুরফুনের মাঠের ভাঙা কেল্লা দেখেছিস তো!"

“আজ্ঞে, তবে দুর থেকে। কেল্লার কাছেপিঠে নাকি যেতে নেই। অজগর যেমন শ্বাস দিয়ে মানুষ, গোরু, মোষ সব টেনে নেয়, তেমনই নাকি ভাঙা কেল্লার ভিতরেও মানুষজনকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে হাপিশ করে ফেলে। সে নাকি ভূতপ্রেতের আখড়া।”

“তোর মাথা, মুখ কোথাকার। যারা কেল্লার ভিতর সোনাদানা খুঁজতে যায়, তারাই ওসব গল্প রটায়। যাতে আর কোনও ভাগীদার না জোটে। তবে খোঁজাই সার, কেউ কিছু পায়নি আজ অবধি।”

মাধাই তাড়াতাড়ি বলল, “তা হলে কেল্লার কথা উঠছে কেন আজ্ঞে! ও যে বড্ড ভয়ের জায়গা!”

কণ্ঠস্বর ফের খিঁচিয়ে উঠে বলল, “আর ধ্যাষ্টামো করিসনি তো মেধো। বলি এতই যদি তোর ভয়, তবে আমার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে দাঁত কেলিয়ে কথা কইছিস কী করে! ভিরমি তো খাসনি!”

মাধাই মিইয়ে গিয়ে মিনমিন করে বলল, “ভয় যে লাগছে না তা তো নয়। একটু-একটু লাগছে।”

“ভয়টা কেমন জানিস! শীতকালে পুকুরে ডুব দেওয়ার মতো। প্রথম ডুবটাই যা শক্ত। তার পরের ডুবগুলোয় আর ঠান্ডা লাগে না। একবার ভয়টা কেটে গেলেই হয়ে গেল। তা ছাড়া দাঁওটাও তো কম নয় রে বাপু। ওখানে যা পাবি তাতে তোরা, তোদের পুত্র পৌত্রাদি, তস্য পুত্র পৌত্রাদি, তস্য পুত্র পৌত্রাদি সাত পুরুষ পায়ের উপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে চর্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে গেলেও ফুরোবে না। বুঝলি! এখন ভেবে দ্যাখ, ভয় পাওয়াটা উচিত কাজ হবে কি না।”

জগাই ঝাঁকি মেরে বলল, “না, ভয়টা কীসের?” মাধাইও গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, “নাঃ, এখন যেন ততটা ভয় লাগছে না।”

"এই তো বাপের ব্যাটার মতো কথা! তা হলে শাবল আর কোদালের জোগাড় দ্যাখ, তারপর গড়িমসি ছেড়ে কাজে নেমে পড়। আগেই বলে রাখি, গুপ্তধন ছেলের হাতের মোয়া নয়। মেহনত করতে হবে। তারপর সোনাদানা দেখে ভিরমি খেয়ে পড়ে যদি অক্কা পাস তা হলে ভোগ করবে কে? কলজে শক্ত করে নে। কথায় বলে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

জগাই একগাল হেসে বলল, "না কণ্ঠদাদা, গায়ে বেশ জোর পাচ্ছি।"

মাধাই লাজুক লাজুক ভাব করে বলল, "তা কত হবে কণ্ঠদাদা? দশ-বিশ হাজার হবে না?"

কণ্ঠস্বর অট্টহাস্য করে বলল, "দুর মুখ! দশ-বিশ হাজার তো পাখির আহার। নজরটা একটু উঁচু কর দেখি মেধোতোর মতো ছোটলোককে গুপ্তধনের সন্ধান দিতে যাওয়াই বৃথা। বড্ড ভুল হয়েছে দেখছি।"

জগাই তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলল, "মাধাইদার কথা ধরবেন না কণ্ঠদাদা। পানুবাবুর একজন পাইক একবার মাথায় গাট্টা মেরেছিল, তারপর থেকেই মাধাইদার মাথাটার গণ্ডগোল। নইলে তোক বড্ড ভাল।"

মাধাইও কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "আজ্ঞে, গরিব মনিষ্যি তো, সোনাদানা আর চোখে দেখলুম কই? তবে রয়ে-সয়ে হয়ে যাবে। এখন থেকে না হয় লাখ-বেলাখের নীচে ভাববই না।"

"তা হলে খুব হুশিয়ার হয়ে শোন। ভাঙা কেল্লার পিছনে উত্তর-পুব কোণে এখনও পড়ো-পড়ো হয়ে কয়েকখানা ঘর খাড়া আছে। একেবারে কোনার ঘরখানায় গিয়ে মেঝের আবর্জনা সরিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণের মেঝেতে শাবল ঠুকলেই বুঝবি ফাঁপা ঢ্যাবট্যাব আওয়াজ আসছে। কোদাল আর শাবল দিয়ে চাড় মারলে বড়সড় পাথরের চাঁই উঠে আসবে। সঙ্গে টর্চ আর মোমবাতি নিয়ে যাস বাপু। গর্তের মধ্যে নেমে পড়লেই দেখবি, দিব্যি একখানা কুঠুরি। তার জানলা-দরজা নেই কিন্তু। একেবারে যমপুরীর অন্ধকার। নেমে সোজা পুব-দক্ষিণ কোণে গিয়ে ফের শাবল ঠুকবি। চাড় মেরে ফের একখানা চাঁই

তুলে ফেলবি। ওর নীচে ফের একখানা ঘর। নেমে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গিয়ে ফের ওরকমভাবেই আর একটা পাথরের চাঁই তুলে ফেলবি। নীচে আর-একখানা ঘর।”

মাধাই বলে, “ওরে বাপ! অত নীচে?”

“তবে কি তোকে কেউ থালায় করে গুপ্তধন বেড়ে দেবে?”

“ঘাট হয়েছে আজ্ঞে। আর ফুট কাটব না। বলুন।”

“নীচের ঘরে নেমে পড়লি তো! এবার উত্তর-পশ্চিম কোণের পাথরটা সরালি। ক’টা হল গুনছিস?”

জগাই বলল, “আজ্ঞে, এটা পাঁচ নম্বর ঘর।”

“মেরেই দিয়েছিস প্রায়। পাঁচ নম্বরে নেমে এবার ফের উত্তর-পূর্ব কোণের পাথর সরিয়ে ছয় নম্বর ঘরে নামবি। এইখানে নেমে ভাল করে ইষ্টনাম স্মরণ করে নিস। বুকটা যেন বেশি ধড়ফড় না করে। কয়েক ঢোক জলও খেয়ে নিতে পারিস। এবার পুব-দক্ষিণের পাথর সরিয়ে যেই নেমে পড়লি অমনি কিন্তু একেবারে হকচকিয়ে যেতে হবে।”

মাধাই শশব্যস্ত বলে উঠল, “কী দেখব সেখানে কণ্ঠদাদা!”

“ওঃ, সে বলার নয় রে, বলার নয়, উফ, সে যা দৃশ্য!”

জগাই হেঁ-হেঁ করে হেসে বলল, “তা কণ্ঠদাদা, আপনার হিস্যা কত?”

“ওসব কথা পরে হবে’খন। এখন কাজে লেগে যা। দেরি করিসনি বাপু, বাতাসেরও কান আছে। যা, যা, বেরিয়ে পড়।”

জগাই-মাধাই উঠে পড়ল।

কোদাল, শাবল, মোমবাতি, টর্চ, জলের ঘটি নিয়ে যখন দু'জনে বেরিয়ে খাল পেরোচ্ছে তখন সন্ধে গড়িয়ে রাত নেমেছে। ভুরফুনের মাঠে ভূতুড়ে কুয়াশা, আবছা জ্যোৎস্না আর হুহু বাতাসে দু'জনেরই একটু ভয়-ভয় করছে।

“কাজটা কি ঠিক হল রে জগাই! হুট বলতেই এই যে একটা বিপদের কাজে রওনা হলুম, শেষে ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু হবে না তো?”

“অত ভেবো না তো মাধাইদা। কণ্ঠদাদার দয়ার শরীর, নইলে কি এত বড় গুহ্য কথাটা আমাদের বলত? আমাদের যা অবস্থা তাতে শিয়াল কুকুরেরও চোখে জল আসে। সেই দুঃখেই না কণ্ঠদাদার মনটা নরম হয়েছে।”

“এই কণ্ঠদাদা লোকটা কে বল তো জগাই?”

জগাই মাথা চুলকে বললে, “লোক না পরলোক তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওসব নিয়ে ভেবে কী হবে বলো। কণ্ঠদাদা তো আমাদের উপকারই করেছে!”

ঠিক মাথার উপর থেকে কে যেন খ্যানখেনে গলায় বলে উঠল, “কে কার উপকার করল শুনি?”

দু' জনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠাহর করে দেখল একটা ঝুপসি গাছের নীচে তারা থেমেছে। শেওড়া গাছ বলেই মনে হচ্ছে। জগাই আর মাধাই পরস্পরের দিকে একটু সরে এল। জগাই ফ্যাসফেসে গলায় বলল, “কণ্ঠদাদা নাকি? গলাটা যে অন্যরকম লাগছে!”

গলার স্বরটা সড়াৎ করে গাছের নীচে নেমে একেবারে তাদের মুখোমুখি হল। বলল, “কণ্ঠদাদা? সেটি আবার কে হে?”

স্বর শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না দেখে এবার তারা ততটা ঘাবড়াল না। আগের অভিজ্ঞতা তো আছে। মাধাই বলল, “আজ্ঞে আমরা কি আর তাকে তেমন চিনি! শুধু কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, দেখা যায়নি। এই আপনার মতোই।”

"বুঝেছি। নিজের নাম কণ্ঠস্বর বলেছে তো!"

"যে আজ্ঞে।"

"মহা নচ্ছার জিনিসের পাল্লায় পড়েছ হে। বলি গুপ্তধনের সন্ধান দিয়েছে নাকি?"

জগাইয়ের গলাটা বড্ড বসে গেছে। ক্ষীণ গলায় বলল, "ওই আর কী!"

"কেল্লার কোণের ঘরে পাথর সরিয়ে সরিয়ে সাত ধাপ নামতে হবে, তাই না?"

মাধাই হতাশ হয়ে বলল, "বলতে নিষেধ ছিল। কিন্তু আপনি দেখছি সবই জানেন। আপনি কে বলুন তো!"

"কুঁড়োরাম রায়ের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ! লোকের মুখে মুখে ফেরে, শোনোনি?"

জগাই মাথা চুলকে বলল, "শুনেছি নাকি মাধাইদা?"

মাধাই ঘাড় চুলকে, মাথা নেড়ে, অনেকক্ষণ ভেবে বলল, "শুনেই থাকব। তবে আমাদের তো মোটা মাথা, তাই কিছু মনে থাকে না। সেইজন্যই তো লেখাপড়া হল না কিনা! আট বছরের চেষ্টায় সাত ঘরের নামতা মুখস্থ হয়।"

জগাই বলল, "আমার তো আকবরের ছেলের নাম আজও মনে নেই। কত বেত খেয়েছি তার জন্য।"

গলার স্বর বলল, "তা আজকাল আর ততটা শোনা যায় না বটে, চ্যাংড়া-প্যাংড়াদের মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু গঞ্জের বুড়ো মানুষদের কাছে নামটা বলে দেখো, জোড় হাত কপালে ঠেকাবে। পরোপকারী হিসেবে একসময়ে খুব নাম ছিল হে আমার। সারাদিন কেবল পরোপকার করে বেড়াতুম। এমন নেশা যে, নাওয়া-খাওয়ার সময় জুটত না। এই কারও কাঠ কেটে দিলুম, কাউকে জল তুলে দিয়ে এলুম, কারও বেড়া বেঁধে দিলুম,

কারও মড়া পুড়িয়ে এলুম, কারও গাছ থেকে নারকোল পেড়ে দিলুম, কাউকে পাঁচটাকা ধার বা কাউকে দু' চার পয়সা ভিক্ষে দিলুম, কারও বাড়িতে ডাকাত পড়লে হাউড় দিয়ে গিয়ে পড়লুম। ওঃ, সে কী পরোপকারের নেশা! তাতে অবশ্য মাঝে মাঝে বিপদেও পড়তে হয়েছে। যেদিন পরোপকারের কিছু খুঁজে পেতাম না সেদিন ভারী পাগল-পাগল লাগত। একদিন তো গণেশ পুতিতুণ্ডর পিঠ চুলকোতে বসে গেলুম। গণেশ তখন খুব মন দিয়ে সেলাই মেশিনের সুচে সুতো পরাচ্ছিল। বাধা পড়ায় এই মারে কি সেই মারে। আর একদিন কাজ না পেয়ে নদীয়া দাসের দাওয়ায় একটা বুড়ো মানুষ শুয়ে আছে দেখে ভাবলুম বুড়ো বয়সে তো লোকের পায়ে ব্যথাট্যথা হয়, তা দিই লোকটার পা টিপে বসেও গেলাম পা টিপতে। লোটা প্রথমটায় উচ্চবাচ্য করল না, একটু বাদে বেজার মুখে বলল, ঝুটমুট মেহনত করছেন বাবু, ওটা আমার কাঠের পা।"

মাধাই হাতজোড় করে কাতর গলায় বলল, "গুরুতর বিষয়কর্ম রয়েছে মশাই, এবার আমাদের বিদেয় হতে আজ্ঞা করুন।"

কুঁড়োরাম ভারী উদাস গলায় বলল, "যাবে? তা যাও! পরের উপকার করা আমি বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। এখন মানুষের বিপদ দেখলেও চুপটি করে থাকি। যা হচ্ছে হোক, আমার কী?"

জোর একখানা গলাখাঁকারি দিয়ে গলার ফাঁসফেঁসে ভাবটা ঝেড়ে ফেলল জগাই। তারপর ভারী শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল, "তা ইয়ে, কুঁড়োরামদাদা, আমাদের কি কোনও বিপদ দেখতে পাচ্ছেন? কথাটা এমনভাবে কইলেন যে বুকের ভিতরটা কেমন খামচা মেরে উঠল।"

মাধাইও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও যেন কেমন একটা হল। ঠিক খামচা নয়, গরম তেলে বেগুন পড়লে যেমন ছাত করে ওঠে, অনেকটা সেরকম।"

জগাই ফের বলল, "কুঁড়োরামদাদা, আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন গতিক সুবিধের নয়!"

মাধাইও পোঁ ধরে বলল, “মনটা যে বড্ড কু গাইছে কুঁড়োদা।”

কুঁড়োরাম বলে উঠল, “ওরে না, না, পরের উপকার করা আমি ভুলেই গেছি। এই তো সেদিন মহেশপুরে ‘মহিষাসুর বধ’ পালায় যে ছোঁকরা চোমরানো গোঁফ লাগিয়ে কার্তিক সেজেছিল, সে একটা সিনের শেষে ছারপোকা কামড়ানোয় গোঁফটা খুলে নাকের নীচে চুলকোতে গিয়ে পরের সিনে গোঁফ লাগাতে ভুলে গিয়েছিল। চোখের সামনে দেখেও কিচ্ছুটি বলিনি। যা হয় হোক, আর হলও তাই। গোঁফ ছাড়া পরের সিনে নামতেই হইহই কাণ্ড। পালা নষ্ট হওয়ার জোগাড়।”

“আমাদের উপর অত বিমুখ হবেন না কুঁড়োদা।”

জগাইও বলে উঠল, “আমাদের গায়ের জোর, মনের জোর, ট্যাঁকের জোর, বরাতের জোর, মুরুব্বির জোর, বুদ্ধির জোর, কোনও জোরই নেই কিনা।”

কুঁড়োরাম ফস করে একটা শ্বাস ফেলার মতো শব্দ ছাড়ল। তারপর বলল, “এই তো সেদিন বর্ষাকালের সন্ধেবেলায় গয়ারামবাবু চণ্ডীমণ্ডপে বসে গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে কূটকচালি করতে করতে আনমনে তামাকের নল ভেবে সাপের লেজ টেনে নিয়ে মুখে দিয়েছিলেন, চোখের সামনে দেখেও কিছু বলেছি কি? কিচ্ছু বলিনি। যা হয় হোক।”

জগাই শশব্যস্তে বলল, “তা কী হল?”

“বরাতের জোর ছিল খুব। সাপটা ছোবলও মেরেছিল বটে, তবে সেটা গিয়ে পড়ল গয়ারামবাবুর খড়মে। তাইতেই সাপটার দুটো বিষদাত ভেঙে রক্তারক্তি কাণ্ড।”

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুঁড়োরাম। সেই শুনে কাঁদো কাঁদো হয়ে মাধাই বলল, “তবে কি আপনি ভাঙা কেল্লায় যেতে মানা করছেন কুঁড়োদা? কিন্তু মেলা সোনাদানা যে তা হলে হাতছাড়া হয়?”

“আমি কেন মানা করব রে? যাবি তো যানা। এই তো একটু আগে, পড়ন্ত বিকেলে গ্যানা গুন্ডার দল লাঠি-সড়কি বন্দুক নিয়ে ভাঙা কেল্লায় গেল। সেখানে তারা জটেশ্বর সাহার ছেলে নবীনের জন্য এখন ওত পেতে বসে আছে। নবীন গঞ্জে আদায় উসুল সেরে তাঁকে ত্রিশটি হাজার টাকা নিয়ে হরিপুরের দিকে এই একটু আগে রওনা হল। সঙ্গে আবার হাড়ে বজ্জাত নিমাইটাকেও জুটিয়েছে দেখলুম। একটু বাদেই সেখানে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। কিন্তু দ্যাখ, তবু কেমন চুপটি করে আছি। না বাপু, আমি আর পরোপকারের মধ্যে নেই। তোরা যেখানে যাচ্ছিস যা বাপু, যা খুশি কর, আমার তাতে কী?”

মাধাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, “গ্যানার দল! ওরে বাবা, তারা যে সাক্ষাৎ যমদূত!”

জগাইয়েরও মুখ শুকোল, “তা হলে কী হবে কুঁড়োদা? আমাদের বড়লোক হওয়া কি কপালে নেই?”

কুঁড়োরাম ভারী উদার গলায় বলল, “তাই কি বললুম রে? বড়লোক হওয়ার আশা যখন হয়েছে তখন গিয়ে কেল্লায় খোঁড়াখুঁড়ি লাগিয়ে দে। সাত ধাপ নীচে নেমে, ঘাম ঝরিয়ে হেদিয়ে গিয়ে যদি লবডঙ্কা পাস, তা হলেও আমি কিছু বলব না।”

মাধাই চোখ বড় বড় করে বলল, “গুপ্তধন কি তা হলে নেই?”

“ওসব আমি জানি না বাপু। তোদের কণ্ঠদাদা যখন বলেছে তখন আমি তোদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে যাব কেন? আজকাল কারও উপকারও যেমন করি না, তেমনই আবার অপকারও করি না কিনা! বুকের জোর আর তাকত থাকলে গিয়ে দ্যাখ না। গুপ্তধনের আগে গ্যানা আছে, তার দলও ঘাপটি মেরে আছে। এসময়ে উটকো লোক হাজির হলেনা বাপু, বড্ড বেশি কথা কয়ে ফেলছি। ওইটেই তো আমার দোষ!”

জগাই কঁদো কাঁদো হয়ে বলল, “কথা কইছেন বটে, তবে সবই তো সাঁটে। পরিষ্কার করে বুঝতে পারছি কই? মাধাইদা, তুমি কিছু বুঝলে?”

মাধাই গম্ভীর হয়ে বলল, "দুটো পয়সার মুখ আর বোধহয় এ জন্মে দেখা হল না রে জগাই।"

কুঁড়োরাম একটু নরম গলায় বলল, "আহা, অত ভেঙে পড়ছিস কেন? তোদের আর ক্ষতিটা কী হল? নবীন সাহার বিপদটা একটু ভেবে দ্যাখ। সে তো ধনে-প্রাণেই মরবে আজ। তোদের তো তবু প্রাণটা আছে।"

মাধাই আর জগাই খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ কুঁড়োরামের কথাটা যেন সেঁধোল মাথায়, মাধাই আচমকা লাফিয়ে উঠে বলল, "তাই তো! নবীনটা যে বড্ড ভাল ছেলে রে জগাই! কতবার আমাদের দোকানে বেগুনি আর মোচার চপ খেয়ে তারিফ করে গেছে!"

জগাইও ঝুঁকি মেরে উঠে পড়ল, "হ্যাঁ তো মাধাইদা! নবীনের যে এত বড় বিপদ সেটা তো খেয়াল হয়নি। তাকে যে হুঁশিয়ার করা দরকার।"

অদৃশ্য কুঁড়োরাম নির্বিকার গলায় বলল, "পরোপকারের বাই চাগাড় দিয়েছে বুঝি! তা ভাল, আমারও চাগাড় দিত কিনা, লক্ষণ খুব চিনি। সেবার গুণময় মণ্ডলের বকনা বাছুর হারিয়ে গেল বলে আমি গোটা পরগনা চষে ফেলেছিলাম। দিনতিনেক বাদে যখন খিদে-তেষ্টায় চিচি করতে করতে বাছুর নিয়ে ফিরলাম, তখন গুণময় কী বলল জানিস? চোখ রাঙিয়ে, সপ্তমে গলা তুলে, পাড়া জানান দিয়ে চেঁচাতে লাগল, তুই হারামজাদাই আমার বাছুর চুরি করেছিলি! থানায় এত্তেলা দেওয়াতে ভয় খেয়ে ফেরত দিতে এসেছিস; চল, তোকে ফাটকে দেব। পাঁচজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল, তারাও বলাবলি করছিল, চুরি করেছিলি তো করেছিলি, বাছুরটা সীতাপুরের গো-হাটায় বেচে দিলেই পারতিস। আহাম্মকের মতো কেউ চুরির জিনিস ফেরত দিতে আসে?' সেবার যে কী নাকাল হতে হয়েছিল তা আর বলার নয়।"

জগাই আমতা-আমতা করে বলল, "এ কথাটাও কি সাঁটে বলা হল কুঁড়োদা?"

মাধাই চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, "তার মানে আমরা নবীনকে বাঁচাতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ব। এঁরা সব ঠিক মানুষ রে জগাই, বহু দূর দেখে তবে কথা কন।"

জগাইয়ের মনটা খারাপ, দুর্বল গলায় বলল, "তা বলে ছেলেটা বেঘোরে প্রাণটা দেবে নাকি মাধাইদা? আমাদের প্রাণের আর কী দাম বলো! ডাকাত-বদমাশের হাতে না মরলেও না-খেয়ে মরা তো কপালে লেখাই আছে। জীবনে কখনও একটা সাহসের কাজ করলুম না। আজ চোখ বুজে একটা করেই ফেলব নাকি মাধাইদা?"

মাধাই অনিচ্ছুক গলায় বলল, "কখনও ডাব-চিংড়ি খেয়েছিস রে জগাই?"

"না তো! কীরকম জিনিস সেটা?"

"আমিও খাইনি। ডাবের মধ্যে চিংড়ি মাছ দিয়ে করে। খেতে নাকি অমৃত, বড় সাধ ছিল মরার আগে একবার ডাব-চিংড়ি খেয়ে মরি। তারপর ধর, সেবার শিবরাত্রির মেলায় কী একটা সিনেমা যেন দেখলুম, তাতে দেখি, ভোরবেলা কাশীর ঘাটে লোকেরা ডনবৈঠক দিচ্ছে। দেখে বড় ইচ্ছে ছিল কাশীতে গিয়ে আমিও একবার ভোরবেলা ওরকম ডনবৈঠক দেব। তারপর ধর, হেঁটো ধুতি পরেই তো জীবনটা কাটল, জীবনে একবার একখানা আশি সুতোর কাপড় পরার বড় ইচ্ছে ছিল রে! দিব্যি কুঁচিয়ে কোঁচা দোলাব, আগাটা আবার ময়ূরের পেখমের মতো একটু ছড়িয়ে পিরানের পকেট থেকে উঁকি মারবে। তা সেসব আর হয়ে উঠল না। সে যাক গে। চল, আজ মরেই দেখি বরং।"

জগাই বিরক্ত হয়ে বলল, "দ্যাখো দিকি কাণ্ড! ওসব কথা কয়ে তুমি যে আমাকে কাহিল করে দিলে। আমারও যে বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল হতে লেগেছে!"

"কেন রে, তোর আবার কী হল?"

"তোমার মতো বড় বড় আশা নেই আমার, কিন্তু ছোটখাটো কয়েকটা সাধ যে আমারও ছিল। ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলুম, কিন্তু এখন সেগুলো চাগাড় মারতে লেগেছে যে!

কেষ্টনগরের সরভাজা খেয়েছ কখনও? লোকে বলে সে নাকি একবার খেলে মরণ অবধি তার স্বাদ জিভে জড়িয়ে থাকে। তারপর ধরো, ওই যে মাউথ অর্গান কী যেন বলে, ঠোঁটে সাঁটিয়ে প্যাপোর-প্যাপোর বাজায়, খুব ইচ্ছে ছিল পয়সা হলে ওর একটা কিনে মনের সুখে হিন্দি গান বাজাব। আর একটা সাধও ছিল, কিন্তু বলতে লজ্জা করছে!"

"আর লজ্জা কীসের রে? একটু বাদেই যাদের মরতে হবে তাদের কি লজ্জা-ঘেন্না-ভয় থাকতে আছে?"

"তা হলে বলেই ফেলি! সেই যে বাজপুরের সত্যেনবাবু কী একটা সুগন্ধী মেখে মাঝে-মাঝে গঞ্জে আসে, শুকেছ কখনও? আহা, গন্ধটা নাকে এলে যেন প্রাণটা জুড়িয়ে যায়, বুক ঠান্ডা হয়, মনটা গ্যাস বেলুনের মতো উপর দিকে উঠে যায়। ইচ্ছে ছিল ওরকম এক শিশি সুগন্ধী কিনে কয়েকদিন কষে মেখে নেব। তা সেসব ভাবতে গেলে তো আর মরাই হবে না আমাদের।"

"যা বলেছিস। বেঁচে থাকলেও ওসব কি আর জুটত রে? তার চেয়ে চল, মরে ফিরে-যাত্রা করে আসি। বীরের মতো মরলে নাকি পরের জন্মটা দুধে-ভাতে কাটানো যায়।"

এতক্ষণ কুঁড়োরাম রা কাড়েনি। জগাই সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, "কুঁড়োদাদা কি এখনও আছেন?"

কুঁড়োরাম একটা জবরদস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আছিও বলা যায়, নেইও বলা যায়। তা হলে মরাই সাব্যস্ত করলে দু'জনে?"

জগাই বলল, "মরার মোটেই ইচ্ছে ছিল না মশাই! তবে কিনা মনে হচ্ছে মরণটাই হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের।"

মাধাই মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, খুঁজে-খুঁজে হয়রান হচ্ছে বেচারা।"

কুঁড়োরাম বলল, "তা হলে বাপু, এগিয়ে পড়ো। পা চালিয়ে হাঁটলে কেল্লার আগেই নবীনকে ধরে ফেলতে পারবে। তারা বেশ দুলকি চালে হাঁটছে, দেখে যেন মনে হয়, হরিপুরে পৌঁছোনোর মোটেই গরজ নেই।"

জগাই বলল, "আচ্ছা মশাই, নবীনের সাঙাত ওই নিমাই লোকটা কে বলুন তো!"

"হাড়বজ্জাত লোক হে। তবে পাজি হতে হলে ওরকমই হতে হয়। যেমন বুদ্ধি, তেমনই চারচোখো নজর, যেমন সাহস তেমনই গায়ের জোর, তার মনের কথা আঁচ করার উপায় নেই কিনা। এই গ্যানার কথাই ধরা, খুনখারাপি, লুটমার করে বেড়ায়, লোকে ভয়ও খায়, কিন্তু মাথায় কি একরত্তি বুদ্ধি আছে? এই যে নিমাই রায় ওর সঙ্গে সাঁট করেছে, শিকার ধরে দিয়ে মজুরি বাবদ কমিশন নেবে, তাতেই গ্যানা কাত। বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারত নিমাই রায় ওকে ল্যাজে খেলাচ্ছে। এই ভুরফুনের মাঠেই একদিন গ্যানাকে পুঁতে ওর দলের দখল নেবে নিমাই। না হে বাপু, বড্ড বেশি কথা কয়ে ফেলছি। তোমরা বরং এগিয়ে পড়ো। সন্ধে সাতটা এগারো মিনিটে মাহেন্দ্রক্ষণ আছে, এই সময়টায় যদি শহিদ হতে পারো তবে সোজা বৈকুণ্ঠলোকে চলে যেতে পারবে।"

মাধাই বিরক্ত হয়ে বলে, "যাচ্ছি মশাই, যাচ্ছি। ওঃ, আমাদের যমের মুখে ঠেলে দিতে যে ভারী আহ্লাদ আপনার!"

খুক করে একটু হাসির শব্দ হল। তারপর কুঁড়োরাম বলল, "কী করব বলল, আজকাল যে আমার রক্তারক্তি কাণ্ড দেখতে বড্ড ভাল লাগে!"

৩. চারদিকে কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না

চারদিকে কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নার ভূতুড়ে আলো, বেশি দূর অবধি চোখ যায় না। মাঝে-মাঝে শেয়ালের দৌড়-পায়ের আওয়াজ, হুতুম প্যাচার গম্ভীর ডাক শোনা যায়। একটা-দুটো বাদুড় চাঁদের চারদিকে চক্কর মেরে উড়ে গেল। উত্তরে হিম বাতাস বইছে খুব। নবীন আর নিমাই কখনও পাশাপাশি, কখনও আগু-পিছু হয়ে হাঁটছে। নিমাইয়ের ডান কাঁধে লাঠিগাছ।

নিমাই হঠাৎ বলল, "কেল্লাটা আর কতদূর বলো তো?"

"আর মিনিট দশেক হাঁটলেই ভাঙা কেল্লা। হরিপুরের অর্ধেক পথ।"

"বাঃ বেশ! এসেই গেলুম প্রায়, কী বলো?"

"তা বটে, তবে আমরা তো আর কেল্লায় যাচ্ছি না, যাচ্ছি হরিপুর। তার এখনও ঢের দেরি। বললাম না, অর্ধেক পথ।"

"ওই হল। কেল্লা এসে গেলেই মার দিয়া কেল্লা। বাকি পথটুকু উড়ে বেরিয়ে যাবে, কী বলে? কথায় বলে না কেল্লা ফতে!'তা ওই কেল্লাটায় কী আছে বলো তো?"

নবীন হেসে বলল, "কী আর থাকবে! ইঁদুর, বাদুড়, চামচিকে, সাপখোপ আছে বলেই তো শুনি! ভূতপ্রেতও নাকি আছে।"

"ভিতরে গেছ কখনও?"

"না। গাঁয়ের গুরুজনরা কেল্লায় যেতে বারণ করত।"

"কেন বলো তো!"

"নানা লোকে নানা কথা বলে। কেল্লা নাকি ভাল জায়গা নয়।"

"দুর, দুর! কেল্লা তোফা জায়গা। আমার তো খুব ইচ্ছে, আর একটু বয়স হলে কেল্লার একধারে একটু সারিয়ে-টারিয়ে নিয়ে থাকব। চারদিকটা ভারী নিরিবিলি।"

"অনেকে কেল্লায় গুপ্তধন খুঁজতেও যায়।" বলে নবীন হাসল।

নিমাই গম্ভীর হয়ে বলল, "হাসির কথা নয়। পাঁচশো কি সাড়ে পাঁচশো বছরের পুরনো কেল্লা। গর্ভগৃহে সোনাদানা থাকা কিছু বিচিত্র নয়। আগের দিনে সোনাদানা সব পুঁতে রাখারই রেওয়াজ ছিল কিনা। আমিও ভাবছি কেল্লায় ডেরা বাঁধার পর রোজ গুপ্তধন খুঁজব। সোনাদানা না পাই, সময়টা তো বেশ কেটে যাবে! কী বলো!"

"আর পেলে?"

"ওঃ, তা হলে তো কথাই নেই। অনেকদিনের ইচ্ছে, একটা মন্দির বানাব, মন্দিরের চুড়োটা হবে সোনায় মোড়া।"

"কোন ঠাকুরের মন্দির?"

"সেইটেই এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। আসলে আমাদের তো মেলা ঠাকুর!"

নিমাই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "আচ্ছা, একটা মন্তর পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে না! এই রাতে উদোম মাঠের মধ্যে মন্তর পড়ছে কে বলো তো!"

নবীন অবাক হয়ে বলল, "কই, আমি তো শুনতে পাচ্ছি না!"

নিমাই চারদিকটা দেখে নিয়ে বলল, "কী কাণ্ড রে বাবা! তুমি শুনতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি যে বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, গুনগুন করে কে যেন মন্তর আওড়াচ্ছে! গম্ভীর গলা, দূর থেকে আসছে মনে হয়।"

নবীন কান খাড়া করে খানিকক্ষণ শুনল। ঝিঁঝির ডাক আর বাতাসের শব্দ ছাড়া কিছুই কানে এল না তার। বলল, "ও আপনার মনের ভুল।"

"মনের ভুল! বলো কী? এই তো স্পষ্ট শুনছি। আস্তে শোনা যাচ্ছে। বটে, কিন্তু গমগমে গলা।"

"তা হলে আমি শুনতে পাচ্ছি না কেন নিমাইদা? আমার কান তো খুব সজাগ। বাগানে একটা শুকনো পাতা খসে পড়লেও শুনতে পাই।"

একথা শুনে নিমাই হঠাৎ গুম হয়ে গেল। আর দ্বিরুক্তি না করে গম্ভীর মুখে ফের হাঁটতে লাগল। এবার আর দুলকি চালে নয়, বেশ হনহন করে। তার সঙ্গে তাল রাখতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছিল নবীনের।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ফের নিমাই জিজ্ঞেস করে, "কেল্লাটা আর কতদূর?"

নবীন বলল, "এসে গেছি প্রায়। ওই বটগাছটা পেরোলেই কেল্লা দেখা যাবে।"

"মন্তরের জোরটা বাড়ছে, বুঝলে? কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।"

"কীসের মন্তর তা বুঝতে পারছেন?"

"তা জানি না। দাঁড়াও, ভাল করে শুনে বলছি। সংস্কৃত তো আর জানা নেই, উচ্চারণ ভুল হতে পারে। এই তো! হ্যাঁ বলছে, মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শকশকশ্যতে চেৎ মৃত্যুমঅবলোপয়। এর মানে জানো?"

"না।"

ফের কিছুক্ষণ শুনে নিমাই বলল, "আরও বলছে যেনাত্মনস্তথান্বেষাং জীবনং বর্দ্ধনং চ অপি প্রিয়তে সঃ ধর্মঃ। দদদদ দদাতু জীবনবৃদ্ধি নিয়-নিয়তং স্মৃতিচিদযুতে। বুঝতে পারলে কিছু?"

"না তো! কিন্তু আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না কেন?"

নিমাই দাঁড়িয়ে উদভ্রান্তের মতো চারদিকে চাইতে লাগল, তারপর ভয়-খাওয়া গলায় বলল, "ভূতুড়ে গলাটা কোথা থেকে আসছে বলো তো?"

"জানি না তো নিমাইদা।" ঠিক এই সময়ে কেল্লার দিক থেকে একটা জোরালো টর্চবাতির আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

নবীন চমকে উঠল, বলল, "নিমাইদা, কেল্লায় টর্চ জ্বালল কে?"

নিমাই উদভ্রান্তের মতো চারদিকে চেয়ে হঠাৎ কাঁধ থেকে লাঠিটা নামিয়ে সেটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর চাপা গলায় বলল, "এ লাঠি কোথায় পেয়েছ?"

"একজন দিয়েছে। কেন বলুন তো!"

নিমাই সভয়ে বলে উঠল, "এই লাঠির ভিতর থেকেই মন্তরের শব্দ আসছে। কানের কাছে নিয়ে দ্যাখো, শুনতে পাবে।"

নবীন লাঠিটা নিয়ে ডান কানে ছোঁয়াতেই শুনতে পেল, গম্ভীর সুরেলা একটা গলা মন্ত্র পাঠ করছে, "মা শ্রিয়স্ব মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুমঅবলোপয়। যেনাত্মস্তথান্বেষাং জীবনং বর্দ্ধনং চ অপি প্রিয়তে সঃ ধর্মঃ। দদাতু জীবনবৃদ্ধি নিয়তং স্মৃতিচিদযুতে।"

নিমাই ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, "ওটা ভুতুড়ে লাঠি। যদি বাঁচতে চাও তো ফেলে দাও।"

নবীন কিন্তু আদপেই ঘাবড়াল না। বরং লাঠিটা বেশ শক্ত করে ধরে কাঁধে ফেলে বলল, "এটা আমার কাছেই থাক।"

নিমাই কেমন উদভ্রান্তের মতো বলল, "না না, ওটা ফেলে দেওয়াই ভাল, কাছে রাখা ঠিক হবে না। এসব জিনিস ভাল নয়।"

নবীনের হঠাৎ যেন জেদ চেপে গেল। সে গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "এটা আমার লাঠি, আমার কাছেই থাকবে।"

ঠিক এই সময়ে কেল্লার দিক থেকে চার-পাঁচটা টর্চের আলো এসে সামনের পথে পড়ল।

নবীন থেমে সভয়ে সেই দিকে চেয়ে নিজের ট্যাঁকে হাত রাখল। ত্রিশ হাজার টাকা গ্রামদেশে বড় কম টাকা নয়। টর্চের আলোগুলো তার ভাল ঠেকছে না। এই নির্জন মাঠের মধ্যে হঠাৎ টর্চের আলো মানেই বিপদ সংকেত।

"নিমাইদা, দেখতে পাচ্ছেন?"

নিমাই গম্ভীর গলায় শুধু বলল, "হুঁ।"

টর্চের আলো তাদের দিকেই বেশ ধেয়ে এল। আলোর পিছনে ছায়ামূর্তির মতো দশ বারোজন লোক। আবছায়াতেও তাদের হাতে লাঠিসোঁটা দেখতে পেল নবীন। হঠাৎ গলাটা শুকিয়ে গেল তার, হাতে-পায়ে খিল ধরার অবস্থা।

"ওরা কারা নিমাইদা?"

"বুঝতে পারছি না। মতলব খারাপও হতে পারে। ওরা দশ বারোজন আছে, হাতে অস্ত্র।"

"তা হলে?"

"আমরা তো ওদের সঙ্গে পেরে উঠব না নবীন। চাইলে যা আছে দিয়ে দিয়ো। আর হাতে লাঠি দেখলে কিন্তু ওরা বিগড়ে যাবে, হাতের অস্তর চালিয়ে দেবে। তুমি বরং লাঠি ফেলে হাতজোড় করে দাঁড়াও।"

নবীনের কেমন যেন সেরকম করতে ইচ্ছে হল না। সে বরং লাঠিটা আরও জোরে চেপে ধরে বলল, "আগে তো দেখি ওরা কারা!"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দৌড়পায়ে এসে লোকগুলো তাদের ঘিরে ফেলল। ওদের টর্চের আলোতেই নবীন দেখতে পেল, শুধু লাঠিই নয়, ওদের হাতে বড় বড় ছোরা, দা, বল্লম আর বন্দুকও আছে। এরা কারা তা বুঝতে আর কোনও কষ্ট নেই।

একটা লম্বা লোক দল থেকে দু'পা এগিয়ে এসে গম্ভীর হিংস্র গলায় বলল, "হাতে লাঠি কেন রে তোর? মারবি নাকি রে? অ্যাঁ! মারবি?"

নবীন বলল, "আজ্ঞে না।"

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ও কথাটা সে বললেও মুখ দিয়ে কিন্তু বেরোল সম্পূর্ণ অন্য কথা, "দরকার হলে মারব।"

লোকটা অবাক হয়ে দু'সেকেন্ড তার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে থেকে হঠাৎ হাঃহাঃ করে হেসে বলল, "বাপ রে! সত্যিই মারবি? আমার যে বড্ড ভয় করছে রে! "

নবীন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আমাকে ছেড়ে দিন। টাকাপয়সা দিয়ে দিচ্ছি, জানে মারবেন না।" কিন্তু এবারেও আশ্চর্যের বিষয় তার মুখ দিয়ে ও কথা না বেরিয়ে বেশ গম্ভীর আওয়াজে বেরোল, "ভয় পাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।"

"বটে!" বলে গ্যানা গম্ভীর হল।

তারপর বলল, "শোন, আজ রাতেই আমার আরও তিনটে ডাকাতি আছে। নইলে তোর সঙ্গে আরও একটু রগড় করতাম। মারধর, রক্তারক্তি করতে চাইনা, ট্যাঁকে যা আছে দিয়ে যা।"

নবীন ট্যাঁকের দিকে হাত বাড়াল বটে, কিন্তু হাতটা ওদিকে মোটে যেতেই চাইল না। লাঠিটা ডান হাতে ধরা ছিল,এবার বাঁ হাতটাও এসে চেপে ধরল সেটা। তারপর হাতেরা দু'ভাই লাঠিটা আস্তে আস্তে উঁচু করে তুলে ধরতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে কোথা থেকে দুটো উটকো লোক দুটো শাবল উঁচিয়ে তেড়ে আসতে আসতে চেঁচাচ্ছিল, "কোথাও ভয় নেই রে নবীন, এই আমরাও তোর সঙ্গেই মরব। এসে গেছি রে?"

এই চিৎকারে ডাকাতেরা ভারী অবাক হল, খানিকটা হকচকিয়েও গেল। গ্যানা বজ্রকণ্ঠে বলল, "চালা অস্তর! নিকেশ কর সব ক'টাকে!"

চোখের পলকে চারদিক থেকে লাঠির বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আবছায়া আলোয় কিছুই ভাল দেখা যাচ্ছিল না। নবীন শুধু বুঝতে পারল তার দু'হাতে ধরা লাঠিখানা বিদ্যুৎগতিতে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর খটাখট শব্দ তুলছে। মাঝে মাঝে বাপ রে', 'উঃ', 'ওরে বাবা' এরকম সব আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যেই কে যেন হেঁকে বলল, "মাহেন্দ্রক্ষণ কি শুরু হয়েছে রে জগাই?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।"

"মরার আগেই যেন পেরিয়ে না যায়, দেখিস!"

"না না, সে আমার খুব খেয়াল আছে।"

ফের ধুন্ধুমার সব শব্দ হতে লাগল। কী হচ্ছে নবীন ঠিক বুঝতে পারছিল না। শুধু এটা বুঝতে পারছে যে, এরকম হওয়ার কথা ছিল না। এ যা হচ্ছে তা একেবারে হিন্দি ছবির ঝাড়পিট।

তবে এ-ও বোঝা যাচ্ছিল প্রতিপক্ষ একটু একটু করে পিছু হটছে। আবছায়ায় একটা লোককে দেখা গেল, ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে পালাচ্ছে, একজন মাথা চেপে ধরে 'বাপ রে, চোখে যে অন্ধকার দেখছি' বলে দিকশূন্য দৌড়ে হাওয়া হল। একজন পেট চেপে ধরে বসে পড়ে তারপর হামাগুড়ি দিয়ে গায়েব হল, একজন 'আর পারি না বাপ' বলে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে অকুস্থল ত্যাগ করল। শেষ পাঁচ-সাতজন কিছুক্ষণ লড়াই দিয়ে

আচমকা সব ক'টা একসঙ্গে কেল্লার দিকে ছুটতে লাগল। তারপর সব ভোঁ ভাঁ। শুধু বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে জগাই মাধাই।

বিস্মিত নবীন হাঁ হয়ে কিছুক্ষণ পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করল। যা ঘটে গেল তা কি সত্যি? স্বপ্ন দেখছে না তো? অনেকক্ষণ লাঠি চালিয়ে একটু হাঁফিয়ে গেছে সে। বড় বড় কয়েকটা শ্বাস নিয়ে সে জগাই আর মাধাইয়ের দিকে চেয়ে করুণ গলায় বলল, "কী হল বলো

তো জগাইদা, মাধাইদা? কিছু বুঝলে?"

জগাই-মাধাই সবেগে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে এক বাক্যে বলল, "কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

মাধাই হ্যাদানো গলায় বলল, "মাহেন্দ্রক্ষণটা কি পেরিয়ে গেল নাকি রে জগাই?"

"তা গেল বোধ হয়।"

"ইস, আমাদের তো দেখছি মরাই হল না! ভাল যোগটা ছিল রে!"

"আহা, মাহেন্দ্রক্ষণে বেঁচে থাকাটাও কি খারাপ মাধাইদা?"

"বেঁচে থেকে হবেটা কী বল! আমাদের কি কোথাও ঠাঁই আছে? পানুবাবুর অত্যাচারে বাপ-পিতেমোর ভিটে ছাড়তে হচ্ছে, কোথায় যাব, কী খাব তারই ঠিক নেই। বরং মরলে ফের আঁটঘাট বেঁধে জন্মানো যেত।"

"না গো মাধাইদা। আগে তাই মনে হচ্ছিল বটে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমরাও কম যাই কীসে? গা বেশ গরম হয়েছে আমার। তিনটে বদমাশকে যা টিট করেছি তা আর কহতব্য নয়। মার খেয়ে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন ভূত দেখছে!"

মাধাই বলল, "তা গা আমারও গরম হয়েছে বটে। আমি তো শাবল দিয়ে একটার হাঁটু ভেঙেছি, একজনের কনুই, তিন নম্বরটার ঘাড়টাই গেছে বোধ হয়।"

"তবেই বোঝো। আমাদের ভিতরে যে এত খ্যামতা ছিল, তা কি আমরাই এতদিন বুঝতে পেরেছি?"

"তা বটে। তবে এত মেহনতের পর খিদেটা যখন চাগাড় দেবে তখনই যে মুশকিল।"

নবীন একটু ধাতস্থ হয়েছে। পায়ের কাছে একটা টর্চ পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আলো জ্বেলে হাতের লাঠিটা খুব মন দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। এতক্ষণ এই লাঠির ভিতর থেকে যে মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছিল সেটা এখন আর নেই। সাধুর দেওয়া লাঠি, কী জাদু আছে এর ভিতরে কে জানে! তবে এ যে যেমন-তেমন লাঠি নয় তা সে খুব বুঝতে পারছে। লাঠিটা দু'হাতে আড় করে ধরে ভক্তিভরে কপালে ঠেকাল সে।

তারপর জগাই আর মাধাইয়ের দিকে ফিরে বলল, "তোমাদের কী হয়েছে জগাইদা?"

"না, এই মাধাইকে বলছিলাম আর কী, গা-টা বেশ গরম হয়েছে।"

"তোমরা এই বিপদের মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলে বলো তো!"

মাধাই বলল, "সে অনেক কথা রে ভাই। তবে তোমার যে এলেম দেখলাম তাতে আমাদের আর হাত লাগানোর দরকার ছিল না।"

নবীন বলল, "ধুস, কিছুই দ্যাখোনি। আমি কখনও লাঠিটাটি খেলিনি, মারপিটও করিনি। ও আমার কোনও কেরদানি নয় গো। অন্য ব্যাপার আছে।"

"কী ব্যাপার বলো তো!"

"তা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল!"

মাধাই বলল, "এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। গুন্ডা বদমাশদের বদ মতলব ফের চাড়া দিতে পারে। এইবেলা রওনা হয়ে পড়ো। হরিপুর এখনও অনেকটা পথ।"

"তোমরা না খিদের কথা বলছিলে?"

জগাই লাজুক গলায় বলল, "ও কিছু নয়। আমাদের যখন-তখন খিদে পায়, সয়েও যায়। ওসব হচ্ছে দেখন-খিদে। একপেট জল খেলেই খিদে উধাও হবে।"

মাধাইও সায় দিয়ে বলল, "ও ঠিক খিদেও নয়। একটু ফাঁকাকা ভাব হয় আর কী! তুমি বরং এগিয়ে পড়ো, আমরাও গঞ্জের দিকে ফিরি।"

নবীন মাথা নেড়ে বলে, "সেটি হচ্ছে না। এই বিপদের মধ্যে আমাকে ফেলে যদি চলে যাও তোমাদের কিন্তু অধর্ম হবে।"

জগাই আর মাধাই পরস্পরের দিকে একটু মুখ তাকাতাকি করে নিল। তারপর জগাই একটু হেসে বলল, "তা অবিশ্যি ঠিক। ভুরফুনের মাঠে শুধু চোর-ডাকাতই তো নয়, তেনারাও আছেন। কী বলো মাধাইদা?"

"আর বলিসনি। দুটো যা স্যাম্পেল দেখলাম, তাতেই পিত্তি চটকে গেছে। না হে নবীনভায়া, তোমাকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। চলো, বরং তোমাকে হরিপুর অবধি এগিয়েই দিয়ে আসি। ফিরতে একটু রাত হবে। তবে আমাদের আর কিবা দিন, কিবা রাত্রি, কী বলিস রে জগাই?"

"তা যা বলেছ।"

তিনজনে রওনা হয়ে পড়ল। নবীনের হাতে লাঠি, দু'জনের হাতে শাবল। হাঁটতে হাঁটতে নবীন হঠাৎ বলল, "আচ্ছা গরম রাঙা চালের ভাতের উপর যদি সোনামুগের ডাল ঢালা হয় তা হলে কেমন শোভা হয় বলো তো?"

জগাই সুড়ুত করে জিভের জল টেনে নিয়ে বলল, "ওঃ, সে একেবারে মারদাঙ্গা ব্যাপার।"

নবীন একটু হেসে বলল, "সঙ্গে দু-চারটে ঝাল কঁচালঙ্কা, না?"

মাধাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "ওতেই ভাত সাবাড়।"

নবীন ফের বলল, "আরে তা কেন? সঙ্গে একটু পোস্ত চচ্চড়িও তো খারাপ নয়! কী বলো!"

জগাই হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, "বাপ রে!"

"কী হল জগাইদা?"

"পোস্তর কথা কি আমাদের শুনতে আছে? ওসব বড়লোকের ব্যাপার, আমাদের শুনলেও পাপ।"

মাধাই বলল, "তা যা বলেছিস।"

নবীন ফের মৃদু হেসে বলল, "আহা, শুনতে দোষ কী? ধরো, ওই সঙ্গে যদি ফুলকপি দিয়ে তেলালো কই মাছের একখানা জম্পেশ ঝোল হয়, তা হলে?"

মাধাই মাথা নেড়ে বলে, "তা হলে বাঁচব না। ওসব হয় না রে নবীনভায়া। ও হচ্ছে রূপকথার গল্প।"

জগাইও মাথা নেড়ে বলে, "কই মাছ নাকি বর্ষাকালে খানিকটা গাছেও ওঠে। তা আমাদের ভাগ্যের কই মাছ গাছ ছেড়ে পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে উঠে বসে আছে।"

নবীন মিটিমিটি হেসে বলল, "কই মাছের পর কারও কারও নাকি আবার রুই মাছের কালিয়া চাখতে ইচ্ছে যায়।"

মাধাই বলল, "যায় নাকি? তা দুনিয়ায় কত পাগল আছে।"

জগাই বলল, "কালিয়া পর্যন্ত পৌঁছোনো বেশ শক্ত।"

নবীন বলল, "অবশ্য ওসব একটু বেশি রাতে। তার আগে কয়েকখানা গরম বেগুনি আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে ছোট ধামার একধামা করে লাল টাটকা মুড়ি খেতে কেমন লাগে বলো তো! মুড়ি খেলে খিদে মজে না, বরং একটু বাদে দ্বিগুণ চাগিয়ে ওঠে। তাই না?"

মাধাই বলল, "বুঝলি রে জগাই, নবীন কিন্তু জানে অনেক।"

জগাই সায় দিয়ে বলল, "তা জানবে না! কত লেখাপড়া শিখেছে! বারোঘরের নামতা জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, মুখস্থ।"

.

ওদিকে কেল্লার একটা ঝুরঝুরে ঘরের ভিতরে দু'খানা মোমবাতি জ্বলছে। তার মৃদু আলোয় দেখা যাচ্ছে, যেন ঘরের মধ্যে একটা শোকসভা। কারও মুখে কথা নেই বটে, তবে 'উঃ', 'আ', 'গেলুম রে' ইত্যাদি চাপা কাতরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। জনাচারেক মেঝেতে সটান শুয়ে কাতরাচ্ছে। যারা বসে বা দাঁড়িয়ে আছে তাদের অবস্থাও সুবিধের নয়। কারও কপালে কালশিটে, কারও কনুই ভাঙা, কারও পায়ে জখম, কারও মাথায় রক্ত জমে ঢিবি হয়ে আছে। দু'থাক ইটের একটা পাঁজার উপর গম্ভীর মুখে নিজের বাঁ হাতের কবজি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে বসে আছে গ্যানা। অনেকক্ষণ কারও মুখে কথাটথা নেই।

এতক্ষণ দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যাচ্ছিল গ্যানা। এইবার কথা কইল। বলল, "ওরে, তোরা খোঁজ নে তো, কাশী না গয়া কোন জায়গাটা ভাল হবে।"

গ্যানার ডান হাত কালু এতক্ষণ বসে বসে কোঁকাচ্ছিল। এবার চোখ তুলে বলল, "কেন ওস্তাদ?"

"আর কি এ সমাজে মুখ দেখানোর জো রইল রে আমার? নাঃ, সব ছেড়েছুঁড়ে কাশীবাসী না হয়ে আমার আর উপায় নেই। একটা পুঁচকে ছোঁড়ার হাতে এতগুলো ঘায়েল হলুম! ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা! গত দশ বছরে আমাকে কেউ হাতে-হাতে লড়াইয়ে জখম করতে পারেনি। সেই গ্যানা ওস্তাদের কবজি ভেঙে দিয়ে গেছে সেদিনকার দুধের ছোঁকরা! গলায় দড়ি দিলে নাকি মরার পর গতি হয় না, নইলে তাই দিতুম। ওরে কালু, কালকেই কাশী বা গয়া যে জায়গা ভাল হয় তার একখানা টিকিট কেটে আনবি। আর এ-সংসারে নয় রে। আর আমার মুখ দেখানোর উপায় রইল না। বুক ফুলিয়ে গায়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতাম, হাজারটা লোক সেলাম ঠুকত। এখন দুয়ো দেবে। ছেলেরা ছড়া কাটবে। আমার গলায় জুতোর মালা পরাবে এবার। সেই অপমান আমার সহ্য হবে না।"

কালু ভাঙা গলায় বলল, "আপনি কাশীবাসী হলে যে দল ভেঙে যাবে সর্দার। আমরা যে না খেতে পেয়ে মরব।"

"সেটাই তোদের প্রায়শ্চিত্ত। আজ যা বীরত্ব দেখালি তাতে তোদের অনশনে মরাই উচিত।"

কালু হঠাৎ তেড়ে উঠে বলল, "সর্দার, সব দোষ ওই নিমাইয়ের, ওই তো আমাদের বলেছিল যে, এবারের শিকার একদম জলভাত। হুড়ো দিলেই নাকি টাকার বান্ডিল বের করে দিয়ে হাতে-পায়ে ধরে প্রাণটা ভিক্ষে চাইবে।"

নিমাই এতক্ষণ একধারে দেওয়াল ঘেঁষে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে ছিল। তারও মাজায় চোট হয়েছে। সনাতন ওস্তাদের চেলা হয়ে কিনা সে মার খেয়েছে জগাই-মাধাইয়ের মতো আনাড়ির কাছে! ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে।

গ্যানা রক্ত চক্ষুতে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, “কালু, রামদাখানা কার কাছে রে? ওটা নিয়ে আয়। এটাকে আজ দু’ আধখানা করে কাটলে তবু খানিক জ্বালা জুড়োবে। কেটে কেল্লার পিছনের পুরনো ইদারায় ফেলে দে।”

কথাটা শুনে নিমাই হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, “গ্যানা, তুমি একটা আহাম্মক।”

গ্যানা তাজ্জব হয়ে অপলক চোখে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, “কী বললি? আহাম্মক না কী যেন! হ্যাঁ রে কালু, ঠিক শুনেছি তো, নাকি কানটা গড়বড় করছে?”

কালু দাঁত কড়মড় করে রামদাখানা পাশ থেকে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, “ঠিকই শুনেছেন। গলা কাটবার আগে ওর জিভটা কেটে ফেলব, তারপর দশ মিনিট বাদে গলা।”

নিমাই বুঝল, সামনে ঘোর বিপদ! সে বলল, “দাঁড়াও, আগে কথাটা শুনে নাও। তারপর গলা কেন, যা খুশি কেটো।”

গ্যানা হুংকার দিয়ে বলে, “কী কথা রে তোর মর্কট? তুই নাকি মস্ত লাঠিবাজ, সনাতন ওস্তাদের চেলা! তা নিজে লেঠেল হয়ে আর একজন লেঠেলকে চিনতে পারলি না! বলে দিলি জলভাত? তা সেই জলভাত দুধের ছোঁকরা যে আমাদের মতো ষণ্ডাদের পিটিয়ে ঢিট করে দিল তা দেখে তোর লজ্জা হচ্ছে না? মরতে ইচ্ছে যাচ্ছে না? মুখে চুনকালি মেখে বেড়ানো উচিত বলে মনে হচ্ছে না?”

নিমাই ঠান্ডা গলায় বলল, “না হচ্ছে না। তার কারণ, নবীন কস্মিনকালেও লেঠেল নয়। ও লাঠি ভাল করে ধরতেও জানে না।”

“বাঃ বাঃ! তা হলে আনাড়ির কাছে মার খেয়ে এলি বল! তা হলে

তো তোর আরও লজ্জা হওয়া উচিত। বাদুড়ের মতো হেঁটমুন্ডু হয়ে ঝুলে থাক। ওরে কালু, কড়িবরগা থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে এটাকে হেঁটমুন্ডু করে রেখে দে তো!”

নিমাই একটু ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল, “সর্দার, ভাল করে শোনো। মাথা ঠান্ডা রাখো। আমরা মোটেই নবীনের হাতে মার খাইনি। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, কাল সকালে হরিপুরে তোক পাঠিয়ে খবর নিলেই জানতে পারবে, নবীন জীবনে লাঠিখেলা শেখেনি।”

“তা হলে লাঠিটা খেলল কে? ভূতে?”

“সেই কথাটাই বলতে চাইছি। কাণ্ডটা ভূতুড়েই বটে। লাঠিটা গঞ্জ থেকেই আমার হাতে ছিল। কাঁধে ফেলে নিয়ে আসছিলাম। মাঝ রাস্তায় হঠাৎ শুনি, লাঠিটার ভিতর থেকে মন্ত্র পড়ার শব্দ আসছে। প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। একটু বাদেই টের পেলাম। প্রথমটায় ভয় খেয়ে আমি লাঠিটা নবীনের হাতে দিয়ে দিই।”

গ্যানা একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, “বিপদে পড়ে এখন মন্ত্রতন্ত্রের গল্প ফেঁদেছিস রে ছুঁচো! তোর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। এই, তোরা ওকে পিছমোড়া করে বাঁধ তো! বেশ কটকটে করে বাঁধবি কিন্তু।”

সর্দারের হুকুম তামিল করার ইচ্ছে থাকলেও জখম গুন্ডাদের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। সবাই যে-যার ব্যথা-বেদনায় কাতরাচ্ছে, ঘ্যাঙাচ্ছে, কোঁকাচ্ছে। বাঁধবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। এমনকী কালু রামদাখানা তুলতে গিয়ে মাজায় খটাং করে শব্দ হওয়ায় ফের উঃ’ বলে বসে পড়েছে। নইলে নিমাইয়ের বিপদ ছিল।

নিমাই বলল, “শোনো সর্দার, আমি তো আর পালাচ্ছি না। আমার বিচার করার সময় পরে অনেক পাবে। তার আগে কাজের কথাটা হয়ে যাক।”

গ্যানা ধমকে ওঠে, “চোপ! তোর মতো বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে আবার কাজের কথা কী রে উল্লুক? তুই বেইমান, নেমকহারাম, বজ্জাত, মিথ্যেবাদী!”

"যা বলতে চাইছি তা যদি খেয়াল করে শোনো, তা হলে আখেরে তোমার মস্ত লাভ হবে। আমার উপর বীরত্ব ফলিয়ে কী হবে? কথাটা শুনে তারপর যা হয় কোরো।"

"কী কথা?"

"লাঠি।"

"লাঠি! ফের লাঠি? তোর লজ্জা হচ্ছে না লাঠির নাম উচ্চারণ করতে? লেঠেলদের বংশে তুই তো কুলাঙ্গার।"

"না সর্দার, আমি ভাল লেঠেল। আর পাকা লেঠেল আমি খুব চিনি। ধরতাই দেখেই বুঝতে পারি। নবীন লেঠেল নয়, কিন্তু তার ওই লাঠির মধ্যে মস্ত কোনও লেঠেলের আত্মা লুকিয়ে আছে। আজ যা দেখলে এ তারই কাণ্ড। ওই লাঠি যদি তোমার হাতে আসে তা হলে গোটা পরগনায় তোমার সঙ্গে কেউ পাল্লা টানতে পারবে না। তোমার সাহস আছে, রোখও আছে, কিন্তু বুদ্ধি নেই, দেখার চোখও নেই। সত্যি কথাটা বললাম। এবার তোমার যা বিচার হয় তাই করো।"

গ্যানা একটু ধন্দে পড়ে গেল। তারও যেন কেন এখন মনে হচ্ছে, কাণ্ডটা স্বাভাবিক নয়। নবীন যদি লেঠেলও হয়ে থাকে, তবু তার দলের এত পাকা লোককে একা পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়াটা অশৈলী কাণ্ড। একটু ভেবে সে বলল, "খোঁজ আমি নিচ্ছি। তা বলে তুই কিন্তু রেহাই পাবি না। যদি আবোলতাবোল বলে ধোঁকা দিয়ে থাকিস, তা হলে যা-যা বলেছি তাই-তাই করব।"

"ঠিক আছে সর্দার। তবে এও বলে রাখছি, ও লাঠির দাম কিন্তু লাখ লাখ টাকা। আজকে যা ঘটল তা চাউর হতে বেশি সময় লাগবে না। বহু পাজি লোকের কানে কালকেই কথাটা চলে যাবে। তখন দেখো, ভাগাড়ে শকুন পড়ার মতো লোক এসে হামলে পড়বে লাঠিটা বাগানোর জন্য। দেরি করলে কিন্তু তুমি পস্তাবে।"

গ্যানা আর-একটু ভেবে বলল, "ঠিক আছে। আজ রাতেই লাঠিটা তুলে আনছি। ওরে কালু, কাউকে হরিপুরে এখনই পাঠিয়ে দে তো বাপু, লাঠিটা নিয়ে আসুক।"

হুকুম শুনে সবাই সিটিয়ে গেল। হরিপুর অনেকটা রাস্তা। কারওই শরীরের তেমন ক্ষমতা নেই যে, এখনই লাঠি চুরি করতে হরিপুর যাবে।

কালু বিমর্ষ মুখে বলে, "আমিই যেতাম সর্দার, কিন্তু মাজায় যা ব্যথা দু'কদম হাঁটার সাধ্যি নেই।"

অন্য কারওই হরিপুর যাওয়ার কোনও উৎসাহ দেখা গেল না। গ্যানার বিস্তর তর্জন-গর্জন এবং শেষে কাকুতি-মিনতি বা বকশিশের লোভেও না।

তখন নিমাই বলল, "আর কেউ যেতে না চাইলে আমি যেতে রাজি আছি।"

গ্যানা বলল, "তোকে বিশ্বাস কী? তুই শিয়ালের মতো চালাক। লাঠিটা হয়তো নিজেই বাগিয়ে নিবি।"

"তোমার তো বন্দুক আছে। যদি বেইমানি করি তা হলে গুলি করে আমাকে মেরো না হয়। লাঠি তো বন্দুকের সঙ্গে পারবে না।"

"তুই লাঠির যা ক্ষমতার কথা বলছিস তা যদি সত্যি হয়, তা হলে ওই লাঠি হয়তো বন্দুকের গুলিও ঠেকাতে পারবে। "

নিমাই হতাশ হয়ে বলল, "তা হলে কি লাঠিটা হাতছাড়া করবে সর্দার?"

গ্যানা গম্ভীর গলায় বলল, "না, না, তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। শুধু একটা কথা মনে রাখতে বলি, যদি বেইমানি করিস তা হলে তোর গাঁয়ে গিয়ে রাতের বেলা তোর ঘরবাড়িতেই আগুন দেব। একটা লোকও বাঁচবে না। বুঝেছিস?"

নিমাইয়ের চোখ দুটো একবার যেন দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। সে চাপা গলায় বলল, “ঠিক আছে।”

“তবে যা, কাল সকালের মধ্যে লাঠি আমার হাতে আসা চাই।”

নিমাই দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়ল। কেল্লার বাইরে এসে সে চারদিকটা একটু দেখে নিয়ে হনহনিয়ে হাঁটা ধরল।

ন’ টায় হরিপুরে নিশুতি রাত। এবার শীতটাও খুব জেকে পড়েছে। তার উপর এই সময়ে আশপাশে চিতাবাঘের উপদ্রব হয় খুব। কাজেই সন্ধের পরেই যে-যার ঘরে ঢুকে যায়। শুধু বাজারের দিকটায় কিছু লোক চলাচল আছে, তবে তাদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়, দু-চারজন সবজি আর মাছের ব্যাপারী এখনও আশায়-আশায় টেমি জ্বেলে বসে আছে। গোটাকয়েক দোকানি এখনও ঝাঁপ ফেলেনি। হালুইকর পীতাম্বর এখন বসে বসে ছাঁচে ফেলে বাতাসার সাইজের সন্দেশ তৈরি করে যাচ্ছে। দরজি ননীগোপাল সেলাই মেশিনে কার যেন লেপের ওয়াড় বানাচ্ছে। ডাক্তার গিরিধারী দাস তার চেম্বারে নব্বই বছর বয়সি খগেন মণ্ডলের নাড়ি টিপে চোখ বুজে বসে আছে। আর সব শুনশান।

নিমাই চাঁদরে মাথা-মুখ ঢেকে নিয়ে সন্তর্পণে বাজারের এলাকাটা পার হল। রাতবিরেতে উটকো লোকের গাঁয়ে আনাগোনা লোকে পছন্দ করে না। হরিপুর নিমাইয়ের চেনা জায়গা নয়, জানাশোনাও নেই কারও সঙ্গে। সুতরাং সাবধান না হলে বিপদ।

পিছন থেকে কে যেন হাঁক মারল, “কে রে? শ্যামাপদ নাকি?”

না, সে শ্যামাপদ নয়। তবু নিমাই দাঁড়িয়ে পড়ল। অচেনা জায়গায় মাথা ঠান্ডা রাখা ভাল। দৌড়ে পালালেই বিপদ। লোকটা কাছে আসতেই সে বিনয়ের সঙ্গে বলল, “না, আমি শ্যামাপদ নই। আমি হলুম নবীনের দূর সম্পর্কের ভগ্নিপোত।”

লোকটা খুশি হয়ে বলল, "ও, ওই লাঠিটার জন্য এসেছ বুঝি? তা ভাল। আজ সবাই তো ওখানে গিয়েই জুটেছে। আমি যদিও বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না, তবু কাণ্ডটা কী তা দেখতেই যাচ্ছি। চলো, চলো!"

নিমাই প্রমাদ গুনল। সর্বনাশ! লাঠির কথা ইতিমধ্যেই তা হলে চাউর হয়ে গেছে! তবে ভিড়ের যেমন অসুবিধে আছে, তেমনই আবার সুবিধেও আছে। সে ভাবতে ভাবতে লোকটার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

৪. পাঁচটা সূর্যমুখী লঙ্কা

পাঁচটা সূর্যমুখী লঙ্কা আর পনেরোখানা বেগুনি দিয়ে ছোট একধামা মুড়ি শেষ করে জল খেয়ে জগাই বলল, "বুঝলে মাধাইদা, এইবার খিদেটা হতে লেগেছে। মুড়িটা পেটে গিয়ে খিদের বীজতলাটা তৈরি হয়ে গেল।"

মাধাই মুড়ির শূন্য ধামাটা সরিয়ে রেখে আধঘটি জল গলায় ঢেলে বলল, "তুই কি জানিস যে, হরিপুর জায়গা খুব খারাপ?"

"কেন গো মাধাইদা, হরিপুরের তো তেমন কোনও বদনাম নেই!"

"সে না থাকলেও এ জায়গা ভাল নয়। এখানকার জল পেটে গেলেই যা খেয়েছিস সব কয়েক মিনিটেই হজম হয়ে যায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফের খিদে চাগাড় দেয়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। হরিপুরের জলের কথা খুব শুনেছি। সবাই সুখ্যাতি করে। তাতে খারাপটা কী দেখলে?"

মাধাই বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, "খারাপ নয়? আমাদের মতো গরিবগুরবোদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পেলে রোজগারের পয়সা যে শুধু পেটপুজোয় খরচ হয়ে যাবে! সেটা কি ভাল? এ জায়গায় থাকলে আমাদের পোষাবে না রে জগাই।"

জগাই একটু চুপ করে থেকে বলল, "এটা একটা ভাববার মতো কথা বটে! পনেরোখানা বেগুনি আর একধামা মুড়ি তো কম নয়। কিন্তু যেই হরিপুরের জল পেটে গেছে অমনই সব যেন কোথায় তলিয়ে গেল! নাঃ মাধাইদা, লক্ষণ মোটেই ভাল নয়।"

"সেই কথাই তো বলছি। এই তো এই বাড়ির গিন্নিমা ডেকে বললেন, রাত্তিরে যেন ডাল দিয়ে বেশি ভাত খেয়ে না ফেলি। আজ নাকি লম্বা খাওয়া আছে। ডাল, ভাজা আর লাবড়ার

তরকারি দিয়ে শুরু। তারপর দুই পদ মাছ আর চাটনি হয়ে নলেন গুড়ের পায়েস অবধি। শুনে ভারী আনন্দও হল। জন্মে তো আর ওসব তেমন খাওয়া হয়নি। আমাদের লঙ্কা আর নুন হলেই একথালা ভাত উঠে যায়। কিন্তু ভয় কী জানিস? পেট ঠেসে খাওয়ার পর যে-ই জলটি খাব অমনই পেটটা ফঁকা-ফঁকা লাগতে থাকবে। মনে হবে, সত্যিই কি কিছু খেয়েছি? নাকি স্বপন দেখছিলুম! তারপর ধর, এই অবস্থায় শিয়রে চিড়ে-মুড়ি কিছু না নিয়ে শুলে মাঝরাত্তিরে যখন পেট চুই চুই শুরু করবে, তখন কী উপায়?”

জগাই ভাবিত হয়ে বলল, “সত্যিই তো! এ তো বড় বিপদের কথা হল! আমাদের গঞ্জের জল যেন পাথর, পেটে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। নড়বার নামটি নেই। যা খাও তা পেটে গিয়ে আড়মোড়া ভাঙে, হাই তোলে, গড়িমসি করতে থাকে, খানিক জিরোয়, একটু ঘুমিয়েও নেয়। তারপর ধীরেসুস্থে সময়মতো নেমে যায়। কিন্তু এখানে তো খাবার দাবার পেটে গিয়ে মোটে বসবার সময় পায় না। হরিপুরের জল গিয়ে তাদের অ্যায়সা তাড়া লাগায় আর এমন হুড়ো দেয় যে, বেচারারা পালাবার পথ পায় না। বেচারাদের দম ফেলার ফুরসতই হচ্ছে না। এই যে মুড়ি-বেগুনি সাঁটলুম, কোথায় গেল বলো তো? পেট তো বেশ খাঁখাঁ করছে। নাঃ মাধাইদা, তুমি ঠিকই বলেছ। হরিপুরে আমাদের পোষাবে না।”

মাধব একটা হাই তুলে বলে, “নবীন অবশ্য বলছিল হরিপুরেই আমাদের একখানা দোকান করে দেবে। বিক্রিবাটা নাকি ভালই। সেটাও একটা ভাববার মতো কথা।”

“হুঁ। প্রস্তাবটা ফ্যালনা নয়। ভাবনাটাবনা তোমার বেশ ভাল আসে। ও তুমিই বসে ভাবো। আমি কিছু ভাবতে গেলেই মাথাটা বড্ড ঝিমঝিম করে।”

ওদিকে নবীনদের উঠোনে গাঁ ঝেটিয়ে লোক এসে জুটেছে। গাঁয়ে আজ যাত্রা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে লোকাভাবে আসর ভেঙে গেছে। দাওয়ার উপর জলচৌকিতে নতুন গামছা পেতে লাঠিটা শোয়ানো হয়েছে। নবীনের জ্যাঠা পরমেশ্বর গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার এবং পঞ্চায়েতের চাই। বলিয়ে কইয়ে মানুষ। পরমেশ্বর দাঁড়িয়ে একখানা ভাষণ শুরু করল,

"বন্ধুগণ, আজ আমরা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের সম্মুখীন। সপ্তম আশ্চর্য পর্যন্ত এতকাল আমাদের জানা ছিল। আগ্রার তাজমহল, চিনের প্রাচীর, মস্কোর ঘণ্টা, মিশরের পিরামিড, আর কী যেন..."

ভিড় থেকে একজন বলল, "মনুমেন্ট!"

আর-একজন চেঁচাল, "কাশীর প্যাঁড়া।"

পরমেশ্বর মাথা নেড়ে বলল, "আরে না, না। হ্যাঁ মনে পড়েছে! ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, টেমস নদীর সুড়ঙ্গ। আর অষ্টম আশ্চর্য আজ দেখলাম, এই লাঠিখানা। এই লাঠিখানা আজ আমার ভাইপো নবীনকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, একদল বদমাশকে পিটিয়ে ঠান্ডা করেছে। এ বড় সোজা লাঠি নয়।"

বিশ্ববোকা হরেন গনাই বলে উঠল, "আহা, লাঠিখানা তো মোটেই বাঁকা নয় হে। দিব্যি সোজা, সটান লাঠি!"

পরমেশ্বর মাথা নেড়ে বলল, "দেখতে সোজা হলে কী হয়, এর মধ্যে স্বয়ং শিব ঢুকে বসে আছেন যে!"

কালীভক্ত চরণ দাস গম্ভীর গলায় বলে, "শিবের হাতে আবার লাঠি কবে দেখলে হে পরমেশ্বর? শিবের হল শূল। তার তিন ফলা।"

বাধা পেয়ে পরমেশ্বর বিরক্ত হয়ে বলল, "আরে শূলটা তো লাঠির মাথাতেই বসানো! ওটা খুলে নিলেই শূল লাঠি হয়ে গেল!"

শ্রীপদ মল্লিক বলে উঠল, "গোঁজামিল দিলেই তো হবে না মশাই, শূল হল শূল, আর লাঠি হল লাঠি। বগি থেকে ইঞ্জিন খুলে নিলেই কি আর রেলগাড়িকে গোরুর গাড়ি বানানো যায়?"

গদাইনস্কর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কিন্তু লাঠিকে ধরা হয় না।"

সবজান্তা সনাতন দাস হেঁকে বলল, "কে বলে ধরা হয় না? স্বয়ং গাঁধীজির হাতে লাঠি ছিল না? ওই লাঠি দিয়ে পেঁদিয়েই তো সাহেবদের বৃন্দাবন দেখালেন!"

গোপাল বৈরাগী ফস করে বলে উঠল, "গাঁধীজিকে মোটেই দেবদেবীদের খাতে ধরা হয় না।"

সনাতন ফুঁসে উঠে বলল, "কে বলল কথাটা? মুখোনা একটু দেখি চাঁদুর! ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলের চুয়ান্ন নম্বর ধারাটা দেখে নিয়ো। গাঁধীজিকে ভগবানের ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া হয়ে গেছে।"

গোপাল বৈরাগী থতমত খেয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

নাস্তিক নবকিশোর বলে উঠল, "অনেকক্ষণ ধরে তো লাঠির মহিমা শোনাচ্ছেন মশাই! এই সায়েন্সের যুগে কেউ মিরাকল বিশ্বাস করে নাকি? মিরাকল-টিরাকল সব মিথ্যে, জ্যোতিষশাস্ত্র একটা বুজরুকি, ভগবান নেই, ভূত নেই! আমাদের বিজ্ঞান যুক্তি সমিতি, সংক্ষেপে 'বিযুস' ঘোষণা করেছে, মিরাকল বা অলৌকিক কিছু প্রমাণ করতে পারলে তাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এখন দেখান তো লাঠির কেরানি!"

বুড়ো পঞ্চানন মণ্ডল মুখের হকিটা এক গাল থেকে অন্য গালে নিয়ে বলল, "ওহে বাপু পরমেশ্বর, এবার জবাব দাও। বাক্য হরে গেল যে! সেই কখন থেকে লাঠির মহিমা দেখার জন্য এসে বসে আছি! তা কোথায় কী? কেবল বক্তিমে হচ্ছে। ওদিকে খিচুড়ি ঠান্ডা হয়ে গেল, হাঁটুতে বাতের ব্যথা চিরিক দিচ্ছে, মাথায় হিম পড়ছে, যত্ত সব..."

তান্ত্রিক জটাধর লাফিয়ে উঠে হুংকার দিয়ে বলে উঠল, "ওরে পাষণ্ড নবা, তোর শিরে যে বজ্রাঘাত হবে! বজ্রাঘাত না হলেও সর্পাঘাত তো নির্ঘাত। পারবি গাজির মোড়ের

বটগাছতলায় রাত বারোটায় নিজের নাম সই করা একখানা কাগজ পাথর চাপা দিয়ে রেখে আসতে? তবে বুঝব তুই বাপের ব্যাটা! বুক ঠুকে বল তো সবার সামনে পারবি কিনা! পারলে তোকেই আমি হাজার টাকা দেব।”

নবা, অর্থাৎ নবকিশোর ভিড়ের মধ্যে একটু পিছিয়ে গেল। ভিড়ের পিছন দিকটায়, মস্ত একটা শিউলি গাছের ঝুপসি ছায়ায়, মাথা-মুখ র‍্যাপারে ঢেকে বসে ছিল নিমাই। চোখ চারদিকে ঘুরছে। শুভ কাজের আগে চারদিকটা ভাল করে জরিপ করে নিতে হয়। কোথা থেকে বিপদ আসতে পারে তা আঁচ করতে হয়, পালানোর পথের হদিশ রাখতে হয়, একই মতলবে অন্য কেউ ঘুরঘুর করছে। কিনা সেটাও দেখা দরকার। আটঘাট না বেঁধে হুড়ুম করে কাজে নেমে পড়াটা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। ওদিকে মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে, সকালে লাঠি নিয়ে কেল্লায় হাজির হতে না পারলে তার বাড়িতে গ্যানা আগুন দেবে। তবে কিনা গ্যানার গায়ের জোর থাকলেও বুদ্ধিটা বড়ই রোগাভোগা। ওই জাদুই লাঠি হাতে এলে নিমাই দরবারে হাজির হবে বটে, তবে অন্য চেহারায়। সব আগেভাগে ভেবে রেখেছে সে। লাঠি উদ্ধার হলে আরও কত কী যে করা যাবে তার লেখাজোখা নেই। ওর জোরে গোটা পরগনাই তার ট্যাঁকে এসে গেল আর কী। মুরুব্বি মাতব্বরেরা দোবেলা সেলাম দেবে। সেলামিও আসবে হাসতে হাসতে। টাকা গোনার জন্য তোক রাখতে হবে। গগনদারোগা একবার তাকে সাতপুরার বিরু মণ্ডলের গোরু চুরির জন্য সাত হাত নাকখত দিইয়েছিল। রাগটা পুষে রেখেছে সে। এবার গগনদারোগা এসে রোজ সন্ধেবেলা তার পা টিপে দেবে। এই সব ভেবে-ভেবে আপনা থেকেই তার ঠোঁটে একটু আহ্লাদের হাসি ফুটে উঠছিল মাঝে মাঝে।

আচমকা কোমরে একটা কনুইয়ের খোঁচা খেয়ে আঁতকে উঠল নিমাই। চেয়ে দ্যাখে, যে লোকটা রাস্তা থেকে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল সেই লোকটা। বড় বড় চোখে ভারী অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে লোকটা বলল, “তুমি এখানে বসে আছ যে বড়? তুমি না নবীনের ভগ্নীপোত! বাড়ির জামাই! মস্ত কুটুম! তোমার ঠাঁই কি এখানে হে! যাও, ভিতর বাড়িতে যাও! বাড়ির কেউ দেখে ফেললে যে বড্ড লজ্জার ব্যাপার হবে হে!”

নিমাই অপ্রস্তুত হয়ে সেঁতো হাসি হেসে বলল, "ভিতর বাড়িতে গেলে শাশুড়িঠাকরুন বড় আতান্তরে পড়ে যাবেন যে! কানাঘুষো শুনলুম, আজ নাকি বাড়িতে চুনো মাছ রান্না হয়েছে। জামাইকে তো আর চুনো মাছ দিয়ে ভাত বেড়ে দেওয়া যায় না! শীতের রাতে হয়তো আবার পুকুরে জাল ফেলতে হবে! তারপর ধরুন, মাছের আগেও তো কিছু দিতে হয় পাতে। সোনামুগের ডাল, কি পোরের ভাজা, কি পোস্তচচ্চড়ি, কি মুড়িঘণ্ট। শেষ পাতে একটু পায়েসটায়েস। না, না, এত রাতে ভিতরে গিয়ে তাদের বিব্রত করা ঠিক হবে না।"

লোকটা উত্তেজিত হয়ে বলল, "তুমি তো আচ্ছা আহাম্মক! বাপু হে, শ্বশুরবাড়ি ছাড়া আমাদের মতো মনিষ্যির কোথাও কোনও দাম আছে? আর সব জায়গায় ঘাড়ধাক্কা খেলেও শ্বশুরবাড়িতে আমরা রাজাগজা। এই তো গেল হপ্তায় রাত বারোটায় শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। শাশুড়িঠাকরুন গায়ে একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে উঠেও পোলোয়া রান্না করে খাওয়ালেন। বোকার মতো বসে থেকো তো! ওঠো, ওঠো, বুক চিতিয়ে বীরের মতো ভিতর বাড়িতে ঢুকে যাও..."

আশপাশের লোক কথাবার্তা শুনে তাকাচ্ছে দেখে নিমাই প্রমাদ গুনে উঠে পড়ল। কাচুমাচু হয়ে বলল, "যাচ্ছি মশাই, যাচ্ছি। এই রাতে গুরুপাক খাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।"

লোকটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, "গুরুপাক! গুরুপাক আবার কী? পেট ঠেসে খাওয়ার পর হরিপুরের একঘটি জল খেয়ে নেবে। পাথর অবধি হজম। বলো তো আমিই তোমাকে সঙ্গে করে অন্দরমহলে পৌঁছে দিয়ে আসছি!"

নিমাই আঁতকে উঠে বলল, "না না, তার দরকার নেই। এ বাড়ির অন্ধিসন্ধি আমার জানা। ছেলেবেলা থেকেই যাতায়াত কিনা!"

"কীরকম, ছেলেবেলা থেকেই যাতায়াত কীরকম? তোমাদের কি বাল্যবিবাহ হয়েছিল নাকি?"

ফাঁপরে পড়ে নিমাই তাড়াতাড়ি বলল, "অনেকটা ওরকমই বটে। আচ্ছা মশাই, আসি গিয়ে তবে!"

বাইরের রাস্তায় এসে নিমাই একটু দাঁড়ায়। কাজটা যে খুব সহজ হবে না তা সে বুঝতে পারছে, একটা বিড়ি ধরাবে কি না ভাবতে ভাবতে সর্বে পকেটে হাত ভরেছে অমনই পিঠে একটা শক্ত খোঁচা খেয়ে বাপ রে' বলে ঘুরে তাকায় নিমাই। যা দেখল তাতে রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার কথা। সামনে দাঁড়িয়ে পানুবাবু। হাতে রুপো বাঁধানো ছড়ি।

পানুবাবুর পরনে কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, চুলে টেরি, গায়ে দামি শাল, গলায় কম্ফটার। এখন শীতকাল বলে হাঁটু অবধি মোজা আর পাম্পশু। ডান আর বাঁ হাতে গোটা কয়েক হিরে, চুনি, পান্নার আংটি ঝকমক করছে।

পানুবাবু ভারী মোলায়েম গলায় বললেন, "সুবিধে হল না বুঝি?"

তটস্থ হয়ে নিমাই হাতজোড় করে বলে, "পানুবাবু যে! পেন্নাম হই! কীসের সুবিধের কথা বলছেন আজ্ঞে? এ জন্মে আর সুবিধে হল কোথায় বলুন। সব তাতেই কেবল অসুবিধে, সুবিধের মুখ আর ইহজন্মে দেখা হল না। তা আপনি এখানে? ইদিকে কাজ ছিল বুঝি?"

পানুবাবু জরদা-পানের পিক ফেলে বললেন, "তা কাজ আছে বই কী। কিন্তু তার আগে জানা দরকার তুই এখানে কী মতলবে ঘুরঘুর করছিস!"

নিমাই মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে, মতলব কিছু নেই। ওই লাঠি নিয়ে কী সব গালগল্প কানে এল, তাই ভাবলুম যাই, গিয়ে একটু দেখে আসি।"

ভারী মোলায়েম আর মিঠে গলায় পানুবাবু বললেন, "কিন্তু আমার কাছে যে অন্য রকম খবর আছে রে নিমাই! ঘণ্টাতিনেক আগে যে তোকে ওই লাঠিখানা কাঁধে নিয়ে নবীনের সঙ্গে ভুরফুনের মাঠে দেখা গেছে!"

নিমাই সিঁটিয়ে গিয়েও ভারী অবাক হওয়ার ভাব করে বলল, "আমাকে দেখা গেছে! ভারী আচযি্যি ব্যাপার তো! কিন্তু আমারই

তো চোখে পড়েনি! ভুল খবর নয় তো পানুবাবু!"

মিষ্টি হেসে পানুবাবু বললেন, "না হে নিমাই, খবর বড় পাকা।"

"তা আপনি যখন বলছেন তখন বোধ হয় তাই হবে।"

ছড়িটা তুলে আচমকা তার পেটে একটা রামখোঁচা দিয়ে পানুবাবু বললেন, "আসল কথাটা কি এবার পেট থেকে বের করবি?"

আঁক করে দু'হাতে পেটটা চেপে ধরে নিমাই বলল, "আজ্ঞে, বলছি, বলছি! ওই নবীন ছোঁকরার সঙ্গে আজই গঞ্জে আলাপ হল কিনা! হাতে লাঠি দেখে দু-চারটে কথা কইলুম। আমি সনাতন ওস্তাদের চেলা শুনে ছোঁকরা আমার কাছে তালিম নিতে চাইল।"

পানুবাবু হোহো করে হেসে বললেন, "বটে! তুই সনাতন ওস্তাদের কাছে লাঠি শিখেছিস বুঝি! কিন্তু আমার কাছে যে অন্যরকম খবর আছে রে নিমাই! তুই সনাতনের কাছে নাড়া বেঁধেছিলি বটে, কিন্তু মাসখানেক বাদেই তার ঘটিবাটি চুরি করে পালাস। তুই তো ছিচকে চোর, লেঠেল হলি কবে?"

নিমাই কোণঠাসা হয়ে ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আজ্ঞে, ইচ্ছে তো ছিল খুব। বড় লেঠেল হব, তা পেটের দায়ে হয়ে উঠল না আজ্ঞে।"

"দ্যাখ, মিথ্যে কথা বলাটাও একটা আর্ট। বাল্মীকি, বেদব্যাস থেকে রবি ঠাকুর অবধি কে না সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে কথা লিখে গেছে! কিন্তু সেসব লোকে মাথায় ঠেকিয়ে পড়ে। আর তুই দাঁত কেলিয়ে যেগুলো বলিস, সেগুলো ছুঁলে চান করতে হয়। বুঝলি!"

ঘাড় হেলিয়ে নিমাই বলল, "যে আজ্ঞে।"

"তবে তোকে আমার দরকার। একজন পাকা চোর না হলে কাজটা উদ্ধার হবে না। ওই লাঠিখানা আমার চাই।"

ভারী ভালমানুষের মতো চোখ বড় বড় করে চেয়ে নিমাই বলে, "সেকী পানুবাবু, সামান্য একখানা বাঁশের লাঠির জন্য আপনিও উতলা হলেন? ওসব গপ্পো বিশ্বাস করেন নাকি?"

পানুবাবু ঠান্ডা চোখে চেয়ে বললেন, "তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুইও করিস! করিস না?"

ঘাড়টাড় চুলকে নিমাই বলে, "কী যে বলেন পানুবাবু!"

"দ্যাখ, বোকা আর আহাম্মকেরা ভাবে আমার বুঝি দুটো মাত্র চোখ। বাইরে থেকে দেখলে চোখ আমার দুটোই বটে, কিন্তু যারা জানে তারা জানে যে, আমার হাজারটা চোখ চারদিকে ঘুরছে।"

সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে নিমাই বলল, "তা বটে।"

"লাঠির গপ্পো যদি সত্যিই না হবে তা হলে পুরনো কেল্লায় যে গ্যানার দলের ষণ্ডা-গুন্ডারা হাতে-পায়ে-মাথায় কাঁকালে লাঠির চোট নিয়ে সব কেঁদেককিয়ে-ঘেঙিয়ে একশা হচ্ছে, তাদের ও দশা করল কে? তোর আর নবীনের মতো দুটো আনাড়ি?"

খুব চিন্তিত মুখ করে নিমাই বলে, "আজ্ঞে, তাও তো বটে! কথাটা ভেবে দেখার মতোই মনে হচ্ছে।"

পানুবাবু ফের একটা রামখোঁচা দেওয়ার জন্য ছড়িখানা তুলতেই নিমাই এক লাফে খানিক পিছিয়ে এসে একগাল হেসে বলল, "কোনওদিন কি আপনার আদেশ অমান্য করেছি পানুবাবু? জলে বাস করে কি কুমিরের সঙ্গে বিসংবাদ চলে? তা ছাড়া আমি ঝামেলা ঝাট, রক্তারক্তির মধ্যে নেইও।"

“আজ রাতেই মালটা সাফ করা চাই।”

ঘাড় চুলকে ভারী লাজুক গলায় নিমাই বলে, “যে আজ্ঞে, তা কীরকম কমিশন দেবেন পানুবাবু?”

“কমিশন ভালই পাবি রে, খুব ভাল। দুনিয়ায় সবচেয়ে দামি জিনিস কী জানিস?”

গদগদ হয়ে নিমাই বলে, “তা আর জানি না! হিরে বলুন, জহরত বলুন, সোনাদানা বলুন, তারপর শাল দোশাল বলুন, কস্তাপেড়ে শাড়ি কি ফরাসডাঙার ধুতি বলুন, তারপর গলদাচিংড়ি কি পাঁঠার মাংস বলুন কোনটা দামি নয়? এমনকী মুড়ির দামও তো ঠেলে উঠছে!”

পানুবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন, “তার চেয়েও ঢের দামি জিনিস আছে রে। গোটা একটা রাজ্য দিলেও তার দাম হয় না, সেটা হল মানুষের প্রাণ। তোকে যে প্রাণে মারব না সেটা কি কম বকশিশ হল নাকি রে বেল্লিক?”

ভারী আপ্যায়িত হয়ে নিমাই বলল, “তা বটে, প্রাণের চেয়ে দামি আর কী-ই বা আছে! তবে কিনা ওই সঙ্গে ফাউ হিসেবেও যদি কিছু পাওয়া যেত!”

“সে আমি ভেবে রেখেছি। জিনিসটা উদ্ধার করতে পারলে তোকে আমার দলে নিয়ে নেব। আমার হয়ে গঞ্জের বাজারে আর হাটবারে তোলা আদায় করবি। কুড়ি পারসেন্ট বাঁধা কমিশন। দু’দিনেই লাল হয়ে যাবি।”

নিমাই মনে মনে ঠিক করে ফেলল, লাঠিটা হাতে আসার পর এই পানুবাবুকে দিয়ে সে দু’বেলা এঁটো বাসন মাজাবে আর ঘরদোর ঝটপাট দেওয়াবে। মাথা ঝাঁকিয়ে হাতজোড় করে সে বলল, “আজ্ঞে, এ তো হাতে চাঁদ পাওয়ার শামিল। কতকাল ধরে ইচ্ছে, আপনার সেবায় একটু লাগি। তা হলে আজ বিদেয় হই পানুবাবু!”

“মনে থাকে যেন!” হাতে এখন অনেক কাজ। মাথা খাটানো, ফন্দিফিকির বের করা, কার্যোদ্ধার করা। সুতরাং নিরিবিলিতে বসে একটু ভাবা দরকার।

রাস্তার ওপাশে একটা ঝুপসি বটগাছ। তলায় জম্পেশ অন্ধকার। নিমাই গুটিগুটি গিয়ে অন্ধকারে সেঁধিয়ে জুত করে বসে পড়ল। তিন চারটে ফিকির আছে হাতে। কোনটা কাজে লাগানো যায় সেইটেই ভেবে ঠিক করতে হবে।

আচমকাই পিঠে গদাম করে কী একটা ভারী জিনিস এসে পড়তেই বাপ রে’ বলে উপুড় হয়ে পড়ল নিমাই। সামলে ওঠার আগেই একটা ভারী গলা চাপা স্বরে বলল, “ওই পানু ব্যাটা কত দর দিল রে?”

নিমাই ধীরে ধীরে উঠে বসল। পিছনে মস্ত একখানা পেতলে বাঁধানোমোটা ভারী লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে হিরু গায়েন। চারটে খুন, গোটা ছয়েক ডাকাতির মামলায় তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ। এই হিরু গায়েনের জন্যই হয়রান হয়ে-হয়ে গগনদারোগার ওজন বারো কেজি কমে গেছে, রাতে ঘুম নেই, খাওয়ায় অরুচি, গোবিন্দচরণ দাস বাবাজির কাছে বোষ্টম মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ফোঁটা-তিলক কণ্ঠী ধারণ করেছে, তবু শান্তি পায়নি।

নিমাইয়ের বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করতে লেগেছে। তবে সেটা চেপে রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, “হিরুদাদা না? আহা, চেহারাটা যে একেবারে আদ্দেক হয়ে গেছে! তা শরীর-গতিক সব ভাল তো! আমরা তো ভেবে ভেবেই মরি, আমাদের আদরের হিরুদাদার হলটা কী? দেখা-সাক্ষাৎ পাই না মোটে!”

চার হাত লম্বা, দুই হাত চওড়া, পাথরে কোঁদা দানবের মতো চেহারার হিরু গায়েন দু’খানা জ্বলজ্বলে চোখে তাকে ফুটো করে দিয়ে বলল, “লাঠির জন্য পানু কত দর দিল?”

মলিন মুখে মাথা নেড়ে নিমাই বলল, “পানুবাবুর হাত মোটেই দরাজ নয়। মুঠো আলগা করতেই চান না। সামান্য দু’লাখ টাকা দিতে চেয়েছেন। আমি চাপাচাপি করায় টেনেমেনে আড়াই লাখে উঠেছেন। আমি তবু গাঁইগুঁই করায় বলেছেন, আরও কিছু দেবেন।”

হিরু তার নাগরা-পরা ডান পা-টা তুলে নিমাইয়ের কাঁকালে ছোট্ট একটা লাথি কষিয়ে বলল, "লাখ টাকা কখনও চোখে দেখেছিস? দিলে গুনে উঠতে পারবি?"

নিমাই কোঁক শব্দ করে ছিটকে গিয়েছিল। মাজা চেপে ধরে উঠে বসে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "সেটাই তো সমস্যা। না হিরুদাদা, লাখ টাকা গুনতে গেলে নির্ঘাত মাথা গুলিয়ে যাবে। আমিও সেই কথাই বলছিলুম পানুবাবুকে, অত টাকার দরকার কী? দু-পাঁচ টাকা কম হলেও হয়। আর তেমন-তেমন লোক হলে আরও দশ-বিশ হাজার কমেই করে দেব না হয়! এই আপনিই যদি ভালবেসে বলেন, 'ওরে নিমাই, লাঠিটা এনে দে, তা হলে কি আমি দর কষতে বসব? আপনজনদের সঙ্গে কি দরকষাকষি চলে?"

হিরু গম্ভীর মুখে বলল, "না, চলে না। দর কষলে তোর মতো আপনজনদের জন্য আমার অন্য ব্যবস্থা আছে। মাজারের পিছনে মজা পুকুরটা চিনিস? সেখানে জল নেই, দশ হাত গভীর থকথকে কাদা। তোকে যদি হেঁটমুন্ডু করে মজা পুকুরে ফেলে দিই, একশো বছরে তোর লাশ কেউ খুঁজে পাবে না তা জানিস?"

ফ্যালফ্যালে হাসি হেসে নিমাই মাখো-মাখো গলায় বলে, "আরে না, না, ছিঃ ছিঃ, এত মেহনত করতে যাবেন কেন? ধকলটাও তত কম যাবে না। নিজের শরীর-গতিকের কথাও তো মনে রাখতে হবে! আপনার দায়িত্ব কি কম? বিশ-পঁচিশটা গাঁয়ের প্রজাপালন আছে, ন্যায়বিচার আছে, এর-ওর-তার তবিল ফাঁক করা আছে, কী খাটুনিটাই যায় আপনার!"

"থাবড়া না খেলে কি মুখ বন্ধ হবে না তোর?"

"উচিত কথাই বলছি। আমরা বলব না তো কি গগনদারোগা বলবে?"

রক্ত-জল করা এক চাউনিতে নিমাই চুপ মেরে গেল। হিরু তেমনই চাপা গলায় বলল, "ও লাঠি আমার চাই, বুঝলি?"

একগাল হেসে নিমাই বলল, "ও তো আপনারই লাঠি! একটা হাঁকাড় ছাড়লেই লোকজন ইঁদুরের মতো পালানোর পথ পাবে না। হাসতে হাসতে গিয়ে তুলে নিন। তারপর লাঠি দোলাতে দোলাতে হেলেদুলে চলে যান। কোথাও আটকাবে না।"

হিরু গর্জন ছেড়ে বলে, "কখনও শুনেছিস, হিরু গায়েন ছ্যাঁচড়ার মতো ছোটখাটো চুরি বাটপাড়ি করেছে কোথাও?"

নিমাই ফের কানে হাত দিয়ে বলে, "কক্ষনও নয়।"

"ওসব তোদের মতো ছুঁচোর কাজ। লাঠিটা আজ রাতেই গোবিন্দপুরের কানু পালের পোড়োবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবি। সেখানে আমার লোক থাকবে।"

নিমাই এতক্ষণ ধরে মনে মনে ভাবছিল লাঠি হাতে পেলে সে হিরু গায়েনকে দিয়ে কী করাবে। এ লোককে বেশি কাছে ঘেঁষতে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে বাড়ির দরোয়ান করে রাখা যেতে পারে। সে মাথা হেলিয়ে বলল, "এসব ছোটখাটো কাজ আপনাকে মানায়ও না। আপনি বড় বড় কাজগুলো দেখুন, ছোটখাটো কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, ওসব আমিই সামলে দেব। তবে হিরুদাদা, এই গরিবের কথাটাও মনে রাখবেন একটু। বেঁচেবর্তে থাকতে আমাদেরও তো একটু সাধ হয় কিনা। পেটটা চলা চাই তো?"

"হ্যাঁ, তবে তার আগে শ্বাসটাও চালু রাখতে হবে তো। লাঠি না পেলে তোর শ্বাসও কিন্তু চলবে না।"

"যে আজ্ঞে। বুঝেছি।"

অন্ধকারে হিরু গায়েন ফট করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিঠে হিরুর ভারী লাঠির খোঁচা আর কোমরে হিরুর নাগরার লাথি একটু কাহিল করে ফেলেছে তাকে। তবে কি নিমাইয়ের সবই সয়। একটু কেতরে সে উঠে দাঁড়াল। হাতে

মেলা কাজ। লাঠির উমেদার যে হারে সংখ্যায় বেড়ে চলেছে তাতে তাড়াতাড়ি বাগাতে না পারলে বেহাত হতে কতক্ষণ! উঁকি মেরে সে দেখল, এখনও নবীনদের বাড়িতে মেলা ভিড়। গোটাচারেক হ্যাজাক জ্বালানো হয়েছে। কে যেন হেঁড়ে গলায় লাঠির মহিমা বিষয়ে একটা বক্তৃতাও দিচ্ছে। নিমাই কান পেতে শুনল, হেঁড়ে গলাটা বলছে, "ভাইসব, বন্ধুগণ, মা ও বোনেরা, লাঠিই বাঙালির সনাতন ঐতিহ্য, লাঠিই আমাদের পুরনো বন্ধু এবং পরমাত্মীয়ও বটে। যেদিন থেকে লাঠিকে অবজ্ঞা করে বাঙালি বোমা বন্দুক ধরেছে সেদিন থেকেই বাঙালির অধঃপতন শুরু হয়েছে। ভেবে দেখুন সাপ মারতে, বেড়াল তাড়াতে, চোরকে ভয় দেখাতে লাঠি চিরকাল কী উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই লাঠি ল্যাংড়া মানুষের ঠ্যাঙের ভূমিকা নেয়, বুড়ো মানুষদের কমজোরি হাঁটুকে সাহায্য করে, লাঠিধারী সেপাইকে আজও মানুষ সমীহ করে। লাঠির সনাতন ঐতিহ্যকে যে আবার ফিরিয়ে আনা দরকার তা নবীনের এই আশ্চর্য লাঠিই প্রমাণ করেছে। ভাইসব, আমি স্থির করেছি আগামী নির্বাচনে আমাদের দলের নির্বাচনী প্রতীক হবে লাঠি। জানি না নির্বাচন কমিশনে লাঠি প্রতীক চিহ্ন আছে কি না, তবে আমার রচনা প্রবেশিকা বইয়ে এবার লাঠি নিয়ে একটা জ্বালাময়ী রচনা আমি ঢুকিয়ে দেব। আপনাদের কাছে নতুন করে রচনা প্রবেশিকার কথা বলার দরকার নেই। আপনারা সকলেই জানেন, রচনা প্রবেশিকা পড়ে ছাত্ররা রচনায় কুড়ির মধ্যে আঠারো-উনিশ নম্বর পর্যন্ত পেয়ে থাকে। গরিব ছাত্রদের কথা ভেবে আমরা রচনা প্রবেশিকার মূল্য এবার আরও কমিয়ে বত্রিশ টাকা করেছি। ভেবে দেখুন, বর্ধিত কলেবরের এই বইটি আরও সুলভে পাওয়ায় কত লাভ হচ্ছে আপনাদের। তাই বন্ধুগণ..."

লোকটা আরও যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সভায় একটা শোরগোল ওঠায় চুপ মেরে গেল।

ভিড়টা একটু পাতলা না হলে লাঠিটা সরানোর ফাঁক পাওয়া যাবে। নিমাই তাই ঘাঁতঘোঁত দেখে রাখার জন্য পা বাড়াল।

কিন্তু আবার বাধা পড়ল, পিঠে একটা শক্ত জিনিসের শক্ত খোঁচার সঙ্গে একটা পিলে-চমকানো গলা, "হ্যান্ডস আপ! হাত তোলো!"।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিমাই বলল, "আজ আমার পিঠের উপর বড় ধকল যাচ্ছে যে দারোগাবাবু!"

একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে গগনদারোগা বলে, "তা হলে তোর পিঠটা একটা পীঠস্থান হয়ে উঠল নাকি রে নিমাই?"

"সে আর কবেন না। তা আপনি ভাল আছেন তো! পেন্নাম হই।"

"বাঃ বাঃ! সহবত তো বেশ ভাল রপ্ত করেছিস দেখছি!"

"আপনাকে ভক্তিছেদ্দা জানাব না তো কাকে জানাব বলুন! আপনি হলেন তল্লাটের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, গুরুজন, পিতৃতুল্য। দেখলেই মাথা আপনা থেকেই হেঁট হয়ে আসে।"

"বাঃ বাঃ! আর-একটু বল তো শুনি!"

"পিস্তলটা খাপে ভরে ফেলুন দারোগাবাবু। আমাদের মতো মনিষিদের জন্য আর পিস্তলকে লজ্জা দেওয়া কেন? অন্তরটার তো একটা মানসম্মান আছে?"

টেকো এবং গোলগাল চেহারার গগনদারোগা পিস্তলটা খাপে ভরে বলে, "এবার বল তো, বটতলার অন্ধকারে বসে কার সঙ্গে শলাপরামর্শ করলি এতক্ষণ!"

নিমাই হেসে একেবারে কুটিপাটি হয়ে বলে, "শলাপরামর্শ! কী যে বলেন দারোগাবাবু, শলাই বা কীসের আর পরামর্শই বা কাকে দেব! আমাকে কথা কইতে শুনেছেন বুঝি! ওই একটা রোগ হয়েছে আমার এই বুড়ো বয়সে। একা-একাই কথা কই। আমার বউও প্রায়ই বলে, ওগো, তুমি যে একা-একা কথা কও, এ তো ভাল লক্ষণ নয়! মাথার দোষ না হয়ে যায়!.."

গগন অবাক হয়ে বলে, "বউ! তোর আবার বউ কোথায়? তুই তো বিয়েই করিসনি!"

ভারী সংকুচিত হয়ে লাজুক হেসে নিমাই বলে, "আজ্ঞে গত অগ্রহায়ণেই করলুম।"

"দ্যাখ নিমাই, তোর নাড়িনক্ষত্র আমি জানি। গত অগ্রহায়ণে তো তুই চুরির দায়ে জেল খাটছিলি?"

জিভ কেটে নিমাই বলে, "ইস, ছিঃ ছিঃ! তাই তো! গত অগ্রহায়ণে নয় তবে! তা হলে বোধ হয় শ্রাবণেই হবে। ঠিক তারিখটা পেটে আসছে, মুখে আসছে না। "

গগন হেসে বলল, "না, শ্রাবণেও নয়, ইহজন্মেও নয়। তোর জন্য ভগবান বউয়ের বরাদ্দই রাখেননি। তিনি বিবেচক মানুষ তো! "

মাথাটাথা চুলকে নিমাই ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আজ্ঞে, কেন যেন মনে হচ্ছিল বিয়েটা যেন করেছিলুম। তা মনের ভুলও হতে পারে। ভীমরতিই হল নাকি কে জানে!"

"বালাই ষাট! ভীমরতি তোর শত্তুরের হোক। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তোর ভীমরতি হবে কোন দুঃখে? তা লোকটা কে?"

"আজ্ঞে কার কথা বলছেন?"

"বটতলার অন্ধকারে যার সঙ্গে ফিসফাস করছিলি! "

বড় বড় চোখে চেয়ে তাড়াতাড়ি জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে নিমাই। বলে, "লোক! বড়বাবু, লোক কাকে বলছেন? নমস্য ব্যক্তি, হ্যাঁ বটে, একসময়ে এই আমার-আপনার মতোই মানুষ ছিলেন বটে, তবে গত তিনশো বছর বায়ুভূত হয়ে আছেন। অসুবিধে কিছু নেই। ওই বটগাছের উপরেই দিব্যি ঘরসংসার। দাস-দাসী, পরিবার ছেলেপুলে নিয়ে জাঁকিয়ে আছেন। তা আমাকে দেখে নেমে এসেছিলেন আর কী। এই বলছিলেন, "ওরে নিমাই, অনেকদিন বাদে এলি যে বাপ! কতকাল তোর দেখা নেই?'তারপর একটু সুখ-দুঃখের কথাও হচ্ছিল। সেইটেই আপনি শুনে থাকবেন।"

গগন হেসে বলে, "উপন্যাস লিখলে নাম করে ফেলতিস রে! তা সাব ইনস্পেক্টর কালোবরণ দাসকে মনে আছে? কেমন সুন্দর মারে। বল! রুল দিয়ে এমন এমন জায়গায় ঘা দেয় যে, ব্রহ্মর অবধি ঝংকার তোলে, কিন্তু গায়ে কোথাও মারের দাগটি খুঁজে পাওয়া যায় লো। কালোবরণকে ভুলে গেলি নাকি রে নিমাই? ভুলে গিয়ে থাকলে বল, আজ রাতেই তোকে থানায় নিয়ে গিয়ে পুরনো কথা একটু ঝালাই করে দিই।"

নিমাই তটস্থ হয়ে বলে, "সে কী কথা! কালোবাবুকে ভুলে যাব আমি কি তেমন নিমকহারাম বড়বাবু? তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ। ঘরে-ঘরে ঠাকুরদেবতার ছবির পাশে তাঁর ছবিও রাখা উচিত। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই ভেবেছিলুম কালোবাবু বোধ হয় বদলি হয়ে গেছেন!"

"তাই যেতেন। তবে তোর মায়াতেই বোধ হয় এখনও আটকে আছেন। তা লোকটা কে এবার ভালয়-ভালয় বলে দে বাপু! জানিস ৃধ, আমার মোটে খিদে সহ্য হয় না। আজ গোবিন্দপুরের তেজেন তপাদারের মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন যে রে! গলদাচিংড়ি হয়েছে শুনেছি। শুনে অবধি খিদে চাগাড় মারছে। আর খিদে পেলে আমার মাথায় যে খুন চাপে এটা কে না জানে বল!"

নিমাই বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে, "তা খিদের দোষটাই বা কী বলুন বড়বাবু! সারা পরগনায় আপনাকে কম দৌড়ঝাঁপ করাচ্ছে ওই হিরু গায়েন! শরীরে এক ছটাক মায়াদয়া থাকলে আপনার এই হয়রানি দেখে কবেই ধরা দিয়ে ফেলত! আমরা হলে তো তাই করতুম। ওরে বাপু, সরকার তো আর তোর পর নয়। দেশশুদ্ধ লোককে খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, আবদার রাখছে, মায়ের মতোই তো! থানা তো মায়েরই কোল। কিছু খারাপ জায়গাও নয়। কম্বল আছে, দোবেলা দু'থালা ভাত আছে, অসুখ হলে চিকিৎসা আছে, মাথার উপর বাবার মতো বড়বাবু আছেন। ধরা দিতে লজ্জাটা কীসের, ভয়ই বা কী?"

সচকিত গগনদারোগা পিস্তলের খাপে হাত রেখে বলল, "ওঃ, তা হলে লোকটা হিরু গায়েন!"

নিমাই হাতজোড় করে বলল, “অন্ধকারে ঠিক দেখেছি কিনা তা কে জানে বলুন। তবে হাতচারেক লম্বা, দু’হাতের মতো চওড়া পাথুরে চেহারা। হাতে পেতলে বাঁধানো লাঠি।”

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে গগন বলে, “কী বলছিল শয়তানটা?”

“আজ্ঞে, সে কি আর ভাল শুনেছি, গেলবার বাঁ কান ঘেঁষে কালোবাবু যে থাপ্পড়টা মেরেছিলেন, তারপর থেকেই কানে বড্ড কম শুনছি। হাবেভাবে মনে হল যেন আপনাকেই খুঁজছেন।”

“আমাকে! আমাকে তার কী দরকার? আমিই তো খুঁজছি তাকে!”

“কী যেন বলছিলেন। গোবিন্দপুরে গেনু পালের পোড়োবাড়িতেই। বোধ হয় আস্তানা গাড়বেন আজ। তা আপনিও তো গোবিন্দপুরেই ভোজ খেতে যাবেন। বড়বাবু! বড্ড ভয় হচ্ছে, একটা রক্তারক্তি না হয়ে যায়। তাঁর মতলবটা ভাল বলে মনে হল না। আপনার ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেলে যে আমরা অনাথ হয়ে যাব! গোটা পরগনা পিতৃহীন হবে।”

শেষটা আর শুনতে পেল না গগন, “তবে রে,” বলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

নিমাই হাঁফ ছাড়ল। খুচরো ঝামেলায় কাজের বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক চেয়ে ভাল করে দেখে নিল সে। নবীনদের বাড়িতে বক্তৃতা শেষ হয়েছে। লোকজন যে-যার বাড়ি ফিরছে। চারদিকে একটা আলগা অসাবধানি ভাব। রাস্তাটা পেরিয়ে সেনবীনের বাড়ির পিছন দিকটায় খড়ের গাদার পিছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরাল। তার দেশলাইয়ের কাঠিটা না নিভিয়ে খুব যত্ন করে গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে একটু সরে এল। শীতকালের শুকনো বাতাসে আগুনটা ধরেছে বেশ দাউদাউ করে। শিখাটা উপর দিকে উঠলেই কাজ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারদিক থেকে চিৎকার উঠল, “আগুন! আগুন! ”

গায়ে আগুন লাগলে এই উত্তুরে বাতাসে সারা গায়েই ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই গা বাঁচাতে হাঁড়ি, কলসি, ঘটি-বাটিতে জল নিয়ে সব লোক ছুটে এল। লাঠিটার কথা কারও খেয়ালই রইল না।

আড়াল থেকে মওকা বুঝে শিয়ালের মতো ছুটে এসে লাঠিটা তুলে বাগানে ঢুকে পড়ল নিমাই। তারপর পিছনের বেড়া ডিঙিয়ে কাঁচা নালাটা পার হয়ে ভুরফুনের মাঠ বরাবর হাটা দিল। না, আর ভয় নেই। মন্ত্রপূত লাঠিখানা হাতে এসে গেছে। এখন সে পরগনার রাজা। আর শিয়ালের মতো ভয়েভয়ে থাকতে হবে না। লাঠির দাপটে টাকাপয়সার লেখাজোখাও থাকবে না তার। ছিচকে চোরের কি কোনও সম্মান আছে সমাজে? গ্যানা বা হিরু গায়েন পথে বেরোলে কেমন মানুষেরা পথ ছেড়ে দেয়। হাতজোড় করে নমস্কারও করে। 'হেঁ-হেঁ' করে কত খাতির দেখায়। দোকানদাররা সওদার পয়সা তো নেয়ই না, বরং উলটে দশ-বিশ টাকা প্রণামী দেয়! লাঠির জোরে সে অবশ্য ওদেরও ছাড়িয়ে যাবে। এখন যেমন এ কিলোয়, ও গুতোয়, সে চোখ রাঙায়, তেমনটি আর হচ্ছে না বাবা!

দূর থেকে নবীনদের বাড়ির আগুনটা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল নিমাই। একটু অবাক হল। যতটা লকলক করে উঠে ছড়িয়ে পড়ার কথা ততটা ছড়ায়নি তো! আগুনটা যেন নিবু নিবু! আগুন নিভে গেলেই লোকের খেয়াল হবে যে, লাঠিটা গায়েব। ধাওয়াও করবে বোধ হয় তাকে। তা করুক। এ লাঠি হাতে থাকতে মিলিটারিকেও পরোয়া নেই।

লাঠি কাঁধে নিয়ে বুক চিতিয়ে হাঁটতে লাগল নিমাই।

৫. জড়ো-হওয়া লোকজন

জড়ো-হওয়া লোকজন সব খানিকটা দমে গিয়ে যে-যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে। লাঠির মহিমা দেখতে এসে শুধু লাঠিখানা ছাড়া আর কিছুই না। দেখতে পেয়ে অনেকেই বেশ হতাশ। তা ছাড়া লাঠিখানার চেহারাতেও তেমন পালিশটালিশ তো নেই। সাধারণ বাঁশের লাঠি। জগাই বলল, "এসব কথা চাউর হওয়াটা ঠিক হয়নি। ওতে মন্তরের জোর কমে যায়। কী বলো মাধাইদা?"

দু'জনে একটু দূরের একখানা দাওয়ায় অন্ধকারে বসা। মাধাই বলল, "গাঁয়ের লোকের তো পেটে কথা থাকে না কিনা!"

জগাই সায় দিয়ে বলে, "ওইটেই তো হয়েছে আমাদের মুশকিল। মাতব্বর লোকেরা কেমন কথার মারপ্যাঁচ জানে দেখেছ! কতটুকু ছাড়তে হবে, কতটুকু চেপে রাখতে হবে, কোন কথা লাটুর মতো ঘোরাতে হবে, কোন কথা ঘুড়ির মতো ওড়াতে হবে তা ভারী ভাল আঁচ করতে পারে। কথার উপরেই দুনিয়াটা চলছে তো! কথায় পুড়িয়ে দিচ্ছে, কথায় জুড়িয়ে দিচ্ছে।"

মাধাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আমরা তো কথাই কইতে শিখলুম না। যা মনে আসে বলে ফেলি। এই তো সেদিন বড় বড় বেগুনি ভেজেছি, পরেশবাবু এসে বললেন, 'কেমন বেগুনি ভাজলি রে?"

আমি বলে ফেললুম, "আজ্ঞে চটিজুতোর সাইজ। শুনে পরেশবাবু খাপ্পা হয়ে এই মারেন কি সেই মারেন, আমি তো কথাটা কয়ে ফেলে ভেবেছিলুম বেশ ভাল একটা কথা কয়েছি।"

"না গো মাধাইদা, কথা কওয়াটা শেখা দরকার। এই পরেশবাবুর কথাই ধরো। প্রায়ই এটা শোঁকেন, সেটা শোঁকেন আর বলেন, 'এঃ, এটায় বোঁটকা গন্ধ, ওটায় টকচা গন্ধ,

সেটায় বাসি গন্ধ। পরেশবাবুর গন্ধের জ্বালায় আর পারি না। তা সেদিন বললুম, পরেশবাবু, আপনার নাক বড় হুশিয়ার, কুকুরকে হার মানায়। শুনেই রেগে লাল হয়ে কষালেন এক থাবড়া। কিন্তু তুমিই বলল, যার যেটা ভাল সেটা তো বলাই উচিত, কুকুরের নাক কি ফ্যালনা জিনিস? কথাটা তলিয়ে দেখলে খারাপও কিছুনয়। কিন্তু কথার দোষে কী দাঁড়াল কে জানে!"

"ওরে জগাই, কুকুরের কথায় খেয়াল হল। কোথায় একটা কুকুরছানা কুঁইকুঁই করছে বল তো!"

"আমিও একটা কুঁইকুই শব্দ পাচ্ছি বটে, তবে ভাবলুম বোধ হয়। চড়াইপাখির ছানা ডাকছে। গাঁ-দেশে ওরকম কত শব্দ হয়।"

"তা বটে। তবে শব্দটা কাছেপিঠেই হচ্ছে কিন্তু।"

"আচ্ছা মাধাইদা, ধর্মত ন্যায্যত একটা কথা বলবে?"

"কী কথা রে?" "তোমার কি খিদে পাচ্ছে? আমার সন্দেহ হচ্ছে, কুঁইকুই আওয়াজ আমাদের পেট থেকেই হচ্ছে।"

"বলতে একটু বাধো বাধো ঠেকছে রে, ভারী লজ্জাও হচ্ছে। তবে ধর্মত বলতে বললি তো, তাই বলছি। খিদেটা কিন্তু নতুন করে হয়নি। ওটা যেন হয়েই আছে, বরং এক কাজ করি আয়। শব্দটাকে। বেড়ালছানার আওয়াজ বলে ধরে নিয়ে চোখ বুজে একটু হরিনাম করি।"

সন্দিগ্ধ গলায় জগাই বলে, "হরিনাম করলে আবার খিদেটা চৌগুণে উঠবে না তো! ঠাকুর-দেবতার নাম নিলে কী থেকে কী হয় কে জানে বাবা!"

"তা সে ভয়ও আছে। হরিনামে খিদে হয় বলেই জানি, তা খিদের উপর যদি আরও খিদে হয় তা হলে বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে' খন। "

দু' জনে হরিনামই করতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে একটা বাচ্চা মেয়ে এসে বলল, "তোমাদের ভাত বাড়া হয়েছে। মা খেতে ডাকছে।"

ভিতরের দাওয়ায় গিয়ে দু'জনে দেখল, দু'খানা থালায় ভাতের মস্ত দুটো ঢিবি। গিন্নিমা ঘিয়ের বয়াম আর বগি হাতা নিয়ে বসে আছেন। করেন কী, করেন কী' বলতে বলতেই খপাখপ দু'হাতা করে ঘি পড়ল ভাতে। সঙ্গে নুন আর কাঁচালঙ্কা।

"খাও বাবা, তোমরা আমার নবীনের প্রাণরক্ষে করেছ। এ বাড়িতে অতিথি হল নারায়ণ। অতিথিসেবা না হলে বাড়ির বাচ্চাটাও কিছু মুখে দেয় না। তাই তোমাদের একটু আগেভাগে খাইয়ে দিচ্ছি।"

তা খেলও দু'জন। ধুতির কষি আগেই একটু আলগা করে নিয়েছিল। কিন্তু সোনামুগের ডাল পার হতে না-হতেই কষি এঁটে গেল। দুই পদের মাছ আর চাটনির পর যখন জামবাটি-ভরতি নলেন গুড়ের পায়েস টেনে নিল তখন কষি যেন কেটে বসেছে। দমসম অবস্থা। খেয়ে যখন উঠতে যাবে তখন দু'জন মুনিশ এসে দু'দিক থেকে ধরে টেনে তুলল দু'জনকে। নইলে ওঠা মুশকিল ছিল। ভরসার কথা এই যে, দু'জনেই খাওয়ার শেষে হরিপুরের রাক্ষুসে জল একঘটি করে মেরে দিয়েছে।

আঁচিয়ে এসে দু'জনে যখন বারঘরে পাতা বিছানায় শুতে যাবে তখনই শোরগোলটা উঠল, "আগুন! আগুন!"

বেরিয়ে এসে খড়ের গাদায় আগুন দেখে দু'জনেই অবাক। তারা গাঁয়েরই লোক। খড়ের গাদার আগুন তারা খুব চেনে। এ বড় সাঙ্ঘাতিক আগুন।

দু'জনে তিলার্ধ দেরি না করে শাবল দুখানা নিয়ে ছুটে গেল। গাঁ বাঁচাতে গাঁয়ের লোকও ছুটে আসছে।

পেট ঢাঁই হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও জগাই খড়ের গাদার মাথায় উঠে পড়ল হাঁচোড়পাঁচোড় করে। বাঁশের খুঁটিতে গাদার বাঁধন খুলে দিতেই গাদার খড় ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আগুন আর বিশেষ সুবিধে পেল না। মাটিতে ছড়ানো জ্বলন্ত খড় নিভিয়ে ফেলা শক্ত কাজ নয়।

নবীন আর তার বাপ-খুড়োরা এসে খুব বাহবা দিল দু'জনকে। বলল, "তোমাদের যেমন সাহস, তেমনই বুদ্ধি আর তেমনই ভাল মানুষ তোমরা।"

দু'জনে লজ্জায় নতমুখ। মাধাই বলে, "কী যে বলেন বাবুরা, আমরা আবার মনিষ্যি!"

জগাই লাজুক গলায় বলল, "ভাল ভাল কথা শুনতে মন্দ লাগে না বটে কর্তা, তবে কী জানেন, আমরা ঘোটলোক তো, ওসব শুনলে আবার পাপ না হয়ে যায়।"

নবীনের জ্যাঠা পরমেশ্বর সাহা হেসে বলল, "পাপ হবে কেন হে? হক কথাই তো কইছি বাপু। তোমাদের দু'জনকে আমাদের ভারী পছন্দ হয়েছে। হরিপুর থেকে তোমাদের আর যেতে দিচ্ছি না।"

শুনে জগাই-মাধাই দু'জনেরই মুখ শুকনো।

মাধাই আমতা আমতা করে বলল, "আজ্ঞে, প্রস্তাব তো খুবই ভাল, কিন্তু আমাদের এ জায়গা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না যে!"

জটেশ্বর অবাক হয়ে বলে, "বলো কী? দশটা গাঁ ঘুরে এসো, সব জায়গায় হরিপুরের সুখ্যাতি শুনবে। লোকে বলে, লক্ষ্মী গাঁ, এখানকার মাটি ভাল, জলবায়ু ভাল, মানুষ ভাল।"

জগাই কাতর গলায় বলে, "কিন্তু হজমের বড্ড গোলমাল হচ্ছে যে!"

নবীনের কাকা হরেশ্বর নাটকটাটক করে। সে রাবণের কায়দায় হাহা করে হেসে বলে, “শোনো কথা! হরিপুরে নাকি হজম হয় না। ওরে বাপু, সকালের জলখাবারের যদি আস্ত একটা হাতিও গিলে ফ্যালো তো দুপুরে এমন খিদে পাবে যে, এক গণ্ডা গন্ডারেও খিদে মিটবে না।”

মাধাই একগাল হেসে বলল, “আজ্ঞে, সে কথাটাই তো বলার চেষ্টা করছি। এখানকার জল খুব খারাপ। খাবারদাবার মোটে পেটে তিষ্টোতে পারে না। সেজগিন্নিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আধঘণ্টা আগে গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়ে উঠেছি, এখনই পেট যেন হুহু করতে লেগেছে। এরকম হলে তো আমাদের মতো গরিব মনিষ্যির বড়ই বিপদ!”

পরমেশ্বর মাথা নেড়ে বলল, “বুঝেছি। তা বাপু, কথাটা মিথ্যেও নয়। হরিপুরে একটু খিদের উৎপাত আছে বটে। তবে ভেবোনা, ওসব সমস্যার সমাধান আমরা করে দেব। আপাতত কিছুদিন আমাদের বাড়িতেই আস্তানা গাড়ো, আমরাও একটু অতিথিসেবা করি। তারপর তোমাদের ব্যবসাপত্তরের ব্যবস্থা হবে।”

ঠিক এই সময়ে নবীন দৌড়ে এসে বলল, “সর্বনাশ হয়ে গেছে। জ্যাঠা! লাঠিটা চুরি হয়ে গেছে!”

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, “সেকী! কে চুরি করল?”

নবীন বলে, “প্যাংলা বলছিল, আগুন লাগার পরেই নাকি ঢ্যাঙা মতো একটা লোককে দেখেছে লাঠিটা নিয়ে দৌড়ে বাগানে ঢুকে গেল। আমার সন্দেহ, এ হল নিমাই রায়ের কাজ। নির্ঘাত বাগান। পেরিয়ে ভুরফুনের মাঠে ঢুকেছে।”

শাবল দুটো তুলে নিয়ে জগাই আর মাধাই বলল, “তা হলে চলুন, ও ব্যাটার কাছ থেকে জিনিসটা কেড়ে নিয়ে আসি।”

বড়জ্যাঠা ফণীশ্বর বলল, "রোসো বাপু, রোসো। ও লাঠির মোকাবিলা করার ক্ষমতা কোথায় তোমাদের? শেষে বিপদে পড়ে যাবে যে!"

জগাই একগাল হেসে বলল, "ভাববেন না জ্যাঠাকর্তা, আমরা দু'জন তো আজ মরতেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। তা কাজটা এখনও হয়ে ওঠেনি। এবার যদি মরি তা হলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

ফণীশ্বর মাথা নেড়ে বলে, "না না, ওটা কাজের কথা নয়, মরায় কোনও বাহাদুরি নেই। জেনেশুনে ওই কালান্তক লাঠির মোকাবিলা কেউ করে?"

নবীন হতাশ গলায় বলে, "তা বলে লাঠি উদ্ধার হবে না? ওর ভিতরে যে মন্তরের শব্দ হয়! ও লাঠি যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে!"

ফণীশ্বর বলল, "তা হলে আমাদের দলবেঁধে যাওয়া উচিত। হেঁকেডেকে লোক জড়ো করো। তারপর সবাই মিলে যাই চলল।"

ভুরফুনের মাঠ বড় ভুলভুলাইয়া জায়গা। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবডালে জলায়-জঙ্গলে কত যে গোলকধাঁধা তার হিসেব নেই। একবার দিশা হারিয়ে ফেললে ঘুরে-ঘুরে মরতে হয়। তার উপর ঘন ভূতুড়ে কুয়াশায় চারদিকটা এমন আবছায়া যে, পুব-পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণ কিছু ঠাহর করার উপায় নেই।

নিমাই অবশ্য তাতে ঘাবড়ায়নি। বরং সে খানিকটা স্বস্তিই বোধ করছে। যদি কেউ পিছু নেওয়ার মতলব আঁটে তবে হয়রান বড় কম হবে না। রাতবিরেতেই তার যতেক কাজকর্ম, কাজেই নিশুত রাতকে সে বন্ধুলোক বলেই ভাবে। রাত যত নিশুত হয়, অন্ধকার যত আঁট হয়ে চেপে বসে ততই কাজের সুবিধে।

তবে আজ ধকলটাও গেছে বড় কম নয়। বিকেলের কচুরি-জিলিপি কখন তল হয়ে গেছে। তার উপর হাঁটাহাঁটি, লাঠালাঠি, ঠেলাগুঁতো, ঝাপড়-লাথিও বড় কম জোটেনি কপালে।

মানুষের শরীর তো! চোর উঁচড় বলে তো আর লোহালক্কড় নয়। তাই আবছায়াতে একটা ঢিবির মতো জায়গা দেখে জিরোনোর জন্য বসতে যাচ্ছিল নিমাই।

মৃদু একটা গলাখাঁকারি দিয়ে কে যেন মোলায়েম স্বরে বলে উঠল, "কাজটা কি ঠিক হবে? ওটা যে সাধুবাবার সমাধি।"

নিমাই টক করে দাড়িয়ে বলল, "তাই নাকি?"

"সমাধি বলে চেনা যায় না বটে। মাটিতে ঢেকে গেছে তো!"

নিমাই এদিক-ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে বলল, "কথাটা কে বললে হে? কাউকে দেখছি না যে!"

"তাজমহল তো আর নই রে বাপু, দেখার কী আছে?"

দুনিয়াটা বাজে লোকে ভরে গেছে। কার যে কী মতলব তা বোঝা কঠিন, তাই লাঠিটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে ফের চারদিকে। ভাল করে চেয়ে দেখে নেয় নিমাই। তারপর বলে, "মতলবটা কী তোমার ?"

"মতলব কিছু খারাপ দেখলে নাকি?"

"লোকটাই বা তুমি কে?"

"এই এখানেই বহুকাল বসবাস। এই সাধুবাবার সমাধিতে হাওয়াটাওয়া করি, পাহারা দিই।"

"তা তো বুঝলুম, কিন্তু গা-ঢাকা দিয়ে আছ কেন?"

খুক করে হেসে লোকটা বলল, "ঢাকবার মতো গা কোথায় হে! তা সে যাক গে, সাধুবাবার লাঠিটা নিয়ে এসেছ দেখছি! নিবেদন করবে নাকি?"

“লাঠি! না না, এ সাধুবাবার লাঠি নয়। এ আমার লাঠি।”

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। লোকটা খানিক চুপ করে থেকে বলল, “তাই হবে বোধ হয়। কে যে কীসের মালিক তা আর আজকাল বুঝবার উপায় নেই কিনা। তবে কী জানো, যার কর্ম তারে সাজে, অন্যের হাতে লাঠি বাজে।”

কথাটার মধ্যে একটু যেন ঘোরপ্যাচ আছে! নিমাই সেটা ধরতে পারল না। বলল, “সাধুবাবা কে হে? গুনিনটুনিন ছিলেন নাকি?”

“সাধু মহাত্মাদের কথা কি নাংলা ভাষায় কওয়া যায়? আর কইলেও তুমি বুঝতে পারবে কি?”

পরিস্থিতিটা নিমাইয়ের খুব সুবিধের বলে মনে হচ্ছিল না। সে লাঠিখানা কাধে ফেলে পা বাড়িয়ে বলল, “চলি হে! তুমি বরং তোমার সাধুবাবার সমাধিতে ভাল করে হাওয়া দাও।”

“চললে নাকি?”

“হ্যাঁ বাপু। আমার মেলা কাজ পড়ে আছে।”

“তা যাবে যাও, তবে একটু দেখেশুনে যেও। বনকরমচার জঙ্গলের দিকটায় পায়ের শব্দ পেলুম যেন।”

শুনে প্রথমটায় কুঁকড়ে গিয়েছিল নিমাই। তারপর লাঠিটার কথা মনে পড়তেই সোজা হয়ে দাড়াল। ভয়টা কীসের? বরং লাঠির ক্ষমতা একটু যাচাইও হয়ে যাবে। সে হেসে বলল, “ও শিয়ালটিয়াল হবে। ভয় নেই! লাঠি দেখলেই পালাবে।”

লোকটার গলাটা ভারী মিইয়ে গেল, বলল, “পালালেই ভাল।”

নিমাই বেশ বীরদর্পেই হাঁটা ধরল। কিন্তু কয়েক কদম এগোতেনা-এগোতেই অন্ধকার ফুঁড়ে দৈত্যদানবের মতো লাঠিধারী জনাবিশেক লোক বেরিয়ে এল। ফস করে একজনের হাতে একটা মশাল জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দিল নিমাইয়ের। তবে সেই আলোয় সে হিরু গায়েনের বিশাল কোঁতকা চেহারাটা দেখতে পেল।

হিরু গর্জন করে উঠল, "লাঠি চুরি করে পালাচ্ছিলি রে শিয়াল?"

নিমাই বরাবর মৃদুভাষী। তর্জনগর্জন তার আসেনা। তবে যথাসাধ্য গম্ভীর গলায় নিমাই বলল, "দ্যাখ হিরু, তোর অনেক বেয়াদবি আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়। যদি ভাল চাস তো দলবল নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে মাপ চা। মারধর করা আমি পছন্দ করি না। বশ্যতা স্বীকার করে নিলে ঝামেলা করব না। চাই কী আমার দরোয়ানের চাকরিও করতে পারবি। দু'বেলা খাওয়া, পরা, হাজার টাকা মাইনে। খারাপ কী বল! নে নে, আর দেরি করিস না। রাত হয়ে যাচ্ছে। হাতে আমার মেলা কাজ।"

হিরু এত অবাক হল যে, প্রথমটায় কিছুক্ষণ কথাই কইতে পারল না। তারপর হঠাৎ বিকট জোরে এমন অট্টহাস্য করে উঠল হাহা করে যে, গাছগাছালিতে পাখিরা প্রাণভয়ে চেঁচামেচি করে ওড়াউড়ি শুরু করল পাগলের মতো।

নিমাই কাঁধ থেকে লাঠিটা নামিয়ে দু'হাতে তুলে ধরতে গিয়ে হঠাৎ টের পেল, লাঠিটা যেন ভারী-ভারী লাগছে! আঁ! এত ভারী হওয়ার তো কথা নয়! হঠাৎ লাঠির ওজনটা এত বেড়ে গেল কেন রে বাবা! নিমাই দু'হাতে বেজায় শক্ত করে ধরে লাঠিটা যতই তুলতে চায় ততই যেন লাঠিটা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ওজনটা কি আরও বেড়ে গেল নাকি? ইঃ রে বাবা, এ তো মোটে তোলাই যাচ্ছে না আর! লাঠির উপর যেন হিমালয় পর্বত চেপে বসছে!

হিরু দাঁত বের করে ধীর কদমে এগিয়ে আসে।

দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, “রাতারাতি বীর হয়ে গেলি নাকি রে নিমাই? আঁ! আবার তুই তোকারি করা হচ্ছে! বুকের এত পাটা হয়েছে যে, আমাকে দরোয়ান রাখতে চাইছিস! সাপের পাঁচ-পা দেখেছিস রে মর্কট ?”

ধাঁ করে হিরুর লাঠির একটা ঘা এসে পড়ল নিমাইয়ের কোমরে। বাপ রে বাপ’ চেঁচিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল নিমাই। তবু সেই অবস্থাতেই লাঠিটা আর একবার তুলবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু লাঠি নড়াতেই পারল না।

পর মুহূর্তেই ঝপাঝপ আরও লাঠি এসে পড়তে লাগল বৃষ্টির মতো। কিছুক্ষণ বাপ রে, মা রে’ বলে চেঁচাল নিমাই। তারপর মাথা ঝিমঝিম আর চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

তার শিথিল হাত থেকে লাঠিটা তুলে নিল হিরু। চমৎকার লাঠি, এ লাঠি চালিয়ে সুখ আছে। তার উপর মন্তরের জোর। এ লাঠি দিয়ে দুনিয়া বশ করা যায়। নিমাইয়ের মতো বেল্লিকের হাতে কি এ জিনিস মানায়?

একটা হাঁকাড় ছেড়ে লাঠিটা দু’হাতে তুলে একটু ঘুরিয়ে দেখল হিরু, বাপ রে, এ যে লাটুর মতো ঘোরে! আশ্চর্য কাণ্ড তো! এ লাঠিতে যে সত্যিই জাদু আছে, হিরু তার এক সাঙাতকে ডেকে বলল, “আয় তো শ্রীনাথ, একটু মহড়া নে তো!”

কিন্তু মহড়া নেবে কী? প্রথম টক্করেই শ্রীনাথের হাতের লাঠিটা উড়ে বিশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল। শ্রীনাথ বেকুবের মতো তাকিয়ে বলল, “একী রে বাবা!”

শ্রীনাথের অবাক হওয়ার কারণ আছে। হিরুর দলে সে-ই সবচেয়ে বড় লেঠেল। হিরুর চেয়েও ভাল, গোটা জেলায় তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কেউ নেই।

শ্রীনাথ গম্ভীর মুখে বলল, “ওস্তাদ, তুমি যা পেয়েছ তার দাম লাখ টাকা।”

হিরু তৃপ্তির হাসি হেসে লাঠিটা কাঁধে তুলে বলল, “চল! দুনিয়া এখন আমার হাতের মুঠোয়।”

হঠাৎ সামনের অন্ধকার কুঁড়ে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল হিরুর মুখে। কে যেন গর্জন করে উঠল, “শাব্বাশ!”

পালটা গর্জন ছেড়ে হিরু বলল, “কে রে? কার এত সাহস যে, আমার মুখে আলো ফেলিস!”

টর্চের পিছন থেকে গ্যানা বলল, “নড়িসনা হিরু, তোর দিকে বন্দুক তাক করা আছে। লাঠিটা সামনে মাটিতে রেখে পিছু সরে যা।”

হিরু ফের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে অট্টহাসি হাসল। বলল, “আমাকে বন্দুক দেখাচ্ছিস রে গ্যানা? বন্দুক! আয় তবে, আমার খেলও একটু দেখে নে!”

বলে হিরু লাঠিটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ বোকা বনে গেল। একী রে বাপ! লাঠি তো বিশমনি পাথরের মতো ভারী! তোলা দূরের কথা, নড়ানোই যাচ্ছে না যে! ধস্তাধস্তিতে কপালে এই শীতেও ঘাম ফুটে উঠল হিরুর। তবু লাঠি নড়ল না। হ্যাঁচকা টান দিয়ে শেষ চেষ্টা করতে গেল হিরু, আর তখনই দুম করে বিকট আওয়াজে গ্যানার বন্দুক থেকে গুলি ছুটল। সোজা এসে বিঁধল তার বাঁ কাঁধে, বাপ রে বলে লাঠি ছেড়ে কাঁধ চেপে বসে পড়ল হিরু। আর সেই সুযোগে গ্যানার। দলবল চড়াও হল হিরুর দলের উপর। মশাল আর টর্চের আবছা আলোয় ধুন্ধুমার চলতে লাগল দুই পক্ষে। মাঝে মাঝে বন্দুকের শব্দ, ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধ।

কী যে হল, কে জিতল, কে হারল তা বুঝবার উপায় রইল না কিছুক্ষণ। তারপর দেখা গেল মাঠময় ত্রিশ-চল্লিশজন লোক নিথর হয়ে পড়ে আছে।

আর এই সময়েই নিজের কুখ্যাত বাহিনী নিয়ে অকুস্থলে হাজির হলেন পানুবাবু। এতক্ষণ একটু আবডালে অপেক্ষা করছিলেন, ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয় তা দেখার জন্য।

একটু মিচকি হাসি হেসে তিনি পড়ে-থাকা হিরুর দুর্বল মুঠো থেকে আলগোছে লাঠিটা তুলে নিলেন। টর্চের আলোয় ভাল করে নিরীক্ষণ ৮৮

করে তিনি স্বগতোক্তি করলেন, "এই লাঠিখানার জন্য এত পেরামনি গেল তোদের, তবু ভোগে লাগল না রে!"

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ফুলবাবুটি হলেও পানু ঘোষ একসময়ে যে ওস্তাদ লেঠেল ছিলেন তা সবাই জানে। লাঠিখানা হাতে নিয়ে তিনি পাখসাট মেরে কয়েক মিনিট বিদ্যুতের গতিতে লাঠিখানা চালালেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, "এ তো সাজ্ঘাতিক জিনিস! এ লাঠি তো চালাতেও হয় না, আপনি চলে!"

পানুবাবুর গুন্ডারা সভয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। পানুবাবু চারদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "চল রে, আমার আবার বেশি রাতে ঘুমোলে পেটে বায়ু হয়।"

"তা হলে চললেন নাকি পানুবাবু!"

পানু ঘোষ দেখল, তিনটি আবছা মূর্তি সামনে পথ জুড়ে দাঁড়ানো। মরা চোখে চেয়ে পানুবাবু সস্নেহে বললেন, "তোরা কারা রে? কী চাস?"

একটু এগিয়ে এসে জগাই হাতজোড় করে বলল, "এই আমরা পানুবাবু। আপনার চাকরবাকরও বলতে পারেন, প্রজাও বলতে পারেন।"

মশালের আলোয় মুখখানা নিরীক্ষণ করে পানুবাবু বললেন, "মুখখানা চেনা-চেনা লাগছে বটে! গঞ্জে তোদের তেলেভাজার দোকান ছিল না?"

মাধাইয়ের দিকে চেয়ে জগাই গদগদ গলায় বলল, "বলেছিলাম না মাধাইদা, আমাদের পানুবাবুর স্মরণশক্তি খুব পরিষ্কার। গরিবদেরও মনে রাখেন ঠিক। আর রাখবেনই বা না কেন! উনি তো গরিবের মা বাপ।"

মাধাই হাতের শাবলখানায় একটু হাত বুলিয়ে বলল, "ওরে, পানুবাবুর কি গুণের লেখাজোখা আছে! পানুবাবুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়ে দে যে, গঞ্জে আমাদের তেলেভাজার একটা দোকান ছিল বটে, তবে পানুবাবু আর তাঁর সাঙাতরা ভারী আদর করে আমাদের তেলেভাজা খেতেন তো, আপনজন মনে করে লজ্জায় দামটা আর সাধতেন না। আমরা অবশ্য তাতে ধন্যই হতুম। তা ধন্য হতে হতে আমাদের তবিল ফাঁক হয়ে গেল কিনা। তা ছাড়া ওঁর নজরানাও তো একটু উঁচু দরেই বাঁধা ছিল। তাই দোকানটা ওঁর দয়ায় উঠে গেছে।"

জগাই ভারী অভিমানের গলায় বলে, "দ্যাখো মাধাইদা, ওইটেই তোমার দোষ। বড় বড় মানুষদের সঙ্গে কথাই কইতে শিখলে না! দেখছ না, বাবু এখন একটা গুরুতর কাজে ব্যস্ত আছেন! এসব ছোটখাটো কথা কয়ে কি ওঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত?"

পানু ঘোষ ভুটা একটু কুঁচকে বললেন, "কী বলতে চাস তোরা বল তো! গঞ্জের বাজারে ব্যবসা করবি আর মানীর সম্মানীদক্ষিণা দিবি না?"

মাধাই ভারী অবাক হয়ে বলল, "এই দ্যাখো, তাই কি বললুম? আপনার ইচ্ছেতেই তো চন্দ্র-সূর্য আজও উঠছে! আমরা না দিলে আপনার চলবেই বা কীসে? প্রজারা খাজনা দিলে তবে তো রাজাগজাদের বারফট্টাই! এই ধরুন গিলে করা পাঞ্জাবি, কাঁচি ধুতি, দামি শাল, এসব তো আকাশ থেকে পড়বে না। তা পানুবাবু, আপনার সেই রুপো বাঁধানো ছড়িখানা কোথায় গেল বলুন তো! সেটা ছেড়ে। এমন একখানা কী বিচ্ছিরি বাঁশের লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন যে বড়! ও কি আপনাকে মানায়? দিন, দিন, ওসব লাঠি এই আমাদের মত ছোটলোকের হাতেই খাপ খায়।"

পানুবাবু হঠাৎ ‘খবরদার’ বলে একটা বিকট চিৎকার করলেন। তারপর তাঁর সাঙাতদের দিকে ফিরে বললেন, “দে তো ধরে দু-চার ঘা। বড় বাড় বেড়েছে দেখছি!”

নবীন একটু পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার এগিয়ে এসে বলল, “পানুকাকা, ও লাঠিটা আমাদের বাড়ি থেকে চুরি গেছে একটু আগে। আমরা ওটা ফেরত নিতে এসেছি। খামকা এ দু’জন নিরীহ লোককে মারধর করবেন কেন? এরা তো কোনও অন্যায় করেনি। লাঠিটা ফেরত পেলেই আমরা চুপচাপ চলে যাব।”

পানুবাবু ধাতস্থ হয়ে মৃদু হেসে মোলায়েম গলায় বললেন, “ওরে বাপু, লাঠির গায়ে তো কারও নাম লেখা নেই! তুমি ভুল করছ বাপু। এ লাঠি আমার ঠাকুরদার আমলের। একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই যত্ন করে রেখেছিলুম। আজ হরিপুরে যাত্রা শুনতে আসার সময় ভাবলুম, ভুরফুনের মাঠ তো ভাল জায়গা নয়, গুন্ডা বদমাশদের আখড়া। তাই ছড়িটা রেখে লাঠিটা নিয়ে গিয়েছিলুম। এ তোমাদের লাঠি নয় হে।”

নবীন দৃঢ়স্বরে বলে, “না, ও লাঠি আপনার নয়।”

“তবে কি আমি মিথ্যে কথা কইছি হে?”

জগাই বলল, “মাধাইদা, পানুবাবু জানতে চাইছেন উনি মিছে কথা কইছেন কিনা। বড় কঠিন প্রশ্ন। ভেবেচিন্তে জবাব দাও তো!”

মাধাই আঙুল দিয়ে কান চুলকে খানিক ভেবে বলল, “বড় মুশকিলে ফেললি রে জগাই। হঁ্যা বললে পানুবাবুর যে বড্ড মন খারাপ হবে। সেটা কি ভাল হবে রে?”

জগাই মাথা নেড়ে বলল, “সেটাও তো গুরুতর কথা। পানুবাবুর মন খারাপ হলে মাথার ঠিক থাকে না কিনা, হয়তো কেঁদেই ফেলবেন। ভাল লোকদের নিয়ে ওই তো বিপদ।”

পানুবাবু হঠাৎ তবে রে’ বলে লাঠি বাগিয়ে ধরে বললেন, “অনেকক্ষণ ধরে বেয়াদবি সহ্য করেছি। আর নয়!”

কিন্তু লাঠিটা তুলতে গিয়ে পানুবাবুর চোখ ইয়া বড় বড় হয়ে গেল। ভারী অবাক হয়ে বললেন, "একী!"

পানুবাবুর গুন্ডার দল অবশ্য সটান এসে চড়াও হল জগাই আর মাধাইয়ের উপর। শাবল তুলে দু'জনে বিদ্যুতের গতিতে চালাতে লাগল। ঠকঠক ঠনঠন শব্দে কান ঝালাপালা।

নবীন নিঃশব্দে গিয়ে হতবাক পানুবাবুর হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে নিল। তারপর শুরু হল লাঠির খেল। সুদর্শন চক্রের মতো নবীনের লাঠি চারদিকে ঘুরতে লাগল। বনবন! বনবন! চোখের পলকে গুন্ডাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র ছিটকে উড়ে যেতে লাগল চারদিকে। 'বাপ রে মা রে' চিৎকার করতে করতে কেউ ঠ্যাং ভেঙে, কেউ মাথায় চোট পেয়ে, কেউ হাত ভেঙে ধরাশায়ী হতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লড়াই শেষ। শুধু পানুবাবু ভারী হতবাক আর স্তম্ভিত হয়ে সেই যে দাড়িয়ে পড়েছিলেন আর নড়েননি।

"এ কী রে জগাই, পানুবাবু এখনও দাড়িয়ে যে!"

জগাই কাছে গিয়ে পানুবাবুর মুখখানা ভাল করে দেখে বলল, "তাই তো! এ তো পানুবাবুই মনে হচ্ছে মাধাইদা! নাঃ, পানুবাবুর সাহস আছে। এত কাণ্ড দেখেও পালাননি কিন্তু।"

"ওরে ভাল করে দ্যাখ, মূছা গেছে কিনা!"

জগাই মাথা চুলকে বলল, "কিছু একটা হয়েছে। যঁ্যা, মাধাইদা, পানুবাবুকে তুমি মারোনি তো!"

জিভ কেটে মাধাই বলে, "ছিঃ ছিঃ, অত বড় মানী লোকের গায়ে হাত তুলতে আছে? একটু ঠেলা দিয়ে দ্যাখ তো।"

"সেটা কি ভাল হবে মাধাইদা? পড়েটড়ে গেলে যে জামাকাপড় নোংরা হবে।"

"কিন্তু সবাই যেখানে শুয়েটুয়ে আছে সেখানে পানুবাবুর এই একা খাড়া দাড়িয়ে থাকা কি ভাল দেখাচ্ছে?"

"বলছ! তা হলে ঠেলব?"।

একটু ঠেলতেই পানুবাবু ধড়াস করে চিতপাত হয়ে পড়ে গেলেন।

"আহা, ভদ্রলোকদের কি ওভাবে ঠেলতে আছে রে জগাই! মেরে ফেলিসনি তো!"

জগাই পানুবাবুর নাকের সামনে হাত দিয়ে বলল, "না গো মাধাইদা, দিব্যি খাস চলছে।"

তিনজন পাশাপাশি দাড়িয়ে রণক্ষেত্রের করুণ চেহারাটা খানিকক্ষণ দেখে যখন ফেরার জন্য ঘুরে দাঁড়াল, তখনই মৃদু গলাখাঁকারির একটা শব্দ পাওয়া গেল।

এদিক-ওদিক চেয়ে কাউকে দেখা গেল না অবশ্য। জগাই সোৎসাহে বলে উঠল, "কণ্ঠদাদা নাকি?"

"আজ্ঞে না।"

মাধাই বলল, "তা হলে নির্ঘাত কুঁড়োরামদাদা।"

"আজ্ঞে না, আমি কুঁড়োরাম নই।"

নবীন অবাক হয়ে বলে, "তবে আপনি কে?"

"আমি সাধুবাবার এক সেবাইত। তার সমাধিতে হাওয়াটাওয়া করি, পাহারা দিই।"

"আপনাকে দেখা যাচ্ছে না কেন?"

"আমি কি আছি, যে দেখবেন?"

“নেই! তা হলে কথা শুনতে পাচ্ছি যে!”

“আমি আপনাদের মতো নেই, আমার মতো আছি।”

নবীন বলল, “বুঝেছি, আমাদের কিছু বলবেন?”

“সাধুবাবা তাঁর লাঠিখানার জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছেন।”

নবীন লাঠিখানা তুলে ধরে বলল, “এটাই কি সাধুবাবার লাঠি?”

“হ্যাঁ।”

নবীন বলল, “ওঁর লাঠি উনিই নেবেন। আমাদের আপত্তি নেই।”

একটা বড় শ্বাস ফেলার মতো আওয়াজ শোনা গেল। গলার স্বর বলল, “আজ আমার বুকটা ঠান্ডা হল। ওই বাঁ দিকে দশ কদম এগোলেই যে মাটির ঢিবি দেখতে পাবেন, সেটাই সাধুবাবার সমাধি।”

তারা ধীর পায়ে দশ কদম এগিয়ে গেল। লম্বাটে ঢিবিটার সামনে দাড়াল।

“এবার কী করব?”

“দক্ষিণ শিয়রে লাঠিটা খাড়া করে রাখুন।”

“পড়ে যাবে যে!”

“না, পড়বে না।” নবীন সমাধির দক্ষিণের শিয়রে লাঠিটা দাড় করিয়ে রেখে হাত সরিয়ে নিল। আশ্চর্য! লাঠিটা দিব্যি দাঁড়িয়ে রইল।

.

সেবাইতের কণ্ঠস্বর বলল, "আর দু-চার দিনের মধ্যেই ওই লাঠির গায়ে পাতা গজাবে। ডালপালা বেরোবে ... লাঠিটা গাছ হয়ে যাবে। ... তারপর কুঁড়ি আসবে ... ফুল ফুটবে। সাদা সুগন্ধি ফুল। গাছ কেঁপে ফুল ফুটবে ... আর সাধুবাবার সমাধির উপর টুপটাপ করে সারাদিন সারারাত ধরে ঝরে পড়বে সাদা সুগন্ধি ফুল। ... আর সাধুবাবা সমাধিতে বড় শান্তিতে ঘুমোবেন তখন ... বড় শান্তি ..."

তিনজনেই সমাধির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নবীন বলল, "তবে তাই হোক। তবে তাই হোক।"

জগাই আর মাধাইও ফিসফিস করে বলল, "তাই হোক, তাই হোক।"